শুদ্ধিপত্র।

জীবনচরিত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৮	প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটিত
৭	২১	পৈত্রিক	পৈতৃক
,,	১৩	অমবশ্যা	অমাবস্যা
৮	৪	সেয়ালদহের	শেয়ালডাঙ্গার
১২	১২	ঈ্বরচন্দ্র	ঈশ্বরচন্দ্র
১৭	১৪	বাটিতে	বাটীতে
১৮	২১	কুলগোরবের	কুলগৌরবের
১৯	১০	এ কথটা	এ কথাটা
২০	৭	পুণ্যময়া	পুণ্যময়ী
২১	১৪	পার্শে	পার্শ্বে
২৫	৩	কার্ত্তি	কীর্ত্তি
২৫	৭	খাদক	খাতক
২৬	১	রঙ্গালাল	রঙ্গলাল
২৯	৫	প্রভাকরে	প্রভাকরকে
৩০	১৫	স্নেহান্মিত	স্নেহান্বিত
৩১	৬	নন্দালাল	নন্দলাল
৩৬	৪	১২৬৪	১১৬৫
৩৬	৩৬	পাষণ্ডপাড়ন	পাষণ্ডপীড়ন
,,	৮	তাঁহা	তাঁহার
,,	৯	মৃত্যুর	মৃত্যুর পর
৩৮	৮	কসেবর	কলেবর
৪৭	২১	দ্বারকাথ	দ্বারকানাথ
৪৮	১০	বৈঠথখানা	বৈঠকখানা

কবিতাসংগ্রহ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	বস	সব
২০	১৯	নাশা	নাসা
৩৫	১৫	বোগী	যোগী
,,	১৬	ময়ুর ময়ুরী	ময়ূর ময়ূরী
৬২	১	ভরঙ্কর	ভয়ঙ্কর
৭০	১০	বিডালাক্ষী	বিড়ালাক্ষী
৭১	৬	নাড়ী	নাড়ি
৭৪	১৬	মেয়েদেয়	মেয়েদের
৭৫	১১	মন	মণ
,,	১২	মণ	মন
৯৬	১৭	পঞ্চার	সঞ্চার
১০৪	১১	দিলেন	দিলেম
১০৬	১৪	ডাকে	ডাকো
১৩৬	১	রবার্টসন	রবিন্সন
১৩৭	৩	পরক্রম	পরাক্রম
১৩৮	১৪	অকাশেরে	আকাশেরে
১৫২	১০	হোয়োছে	হোয়েছে
১৫৩	১	প্রাদুর্ভাব	প্রাদুর্ভাব
১৭৩	১৯	মোন মতে	কোনমতে
১৭৫	১৭	ব্যাঙ্গ	ব্যঙ্গ
১৭৭	১০	ভের	ফের
২০৮	৭	রাজ্রহংস	রাজহংস
২২৮	৮	কোম	কোন
২৪১	৭	পাঁহাড়ে	পাহাড়ে
২৬৯	১	পেথিক	পথিক
২৮৪	৫	নহি	নাহি
২৮৬	৫	তোমারে	তোমার

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকীয়তায়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্ত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সূত্রে যদি ভাষার কোনো উপকারের সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা হইলে, সেই উপকার এবং গৌরব, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাঁহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ, তাহার উপর এই আর একটী ঋণ বাড়িল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বঙ্কিম বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কি না সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষার শিরে আর একটী সুরভিপূর্ণ কুসুম অর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল মাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়, তাহা হইলে, অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে পারিব, এমত আশা করি।

এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবেন, অনুষ্ঠানপত্রেই তাঁহা প্রচার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কলিকাতা।
আহিরীটোলা
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১৫ই আশ্বিন, ১২৯২সাল।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকীয়তায়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্ত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সূত্রে যদি ভাষার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা হইলে, সেই উপকার এবং গৌরব, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাঁহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ, তাহার উপর এই আর একটী ঋণ বাড়িল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বঙ্কিম বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কি না সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষার শিরে আর একটী সুরভিপূর্ণ কুসুম অর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল মাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়, তাহা হইলে, অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে পারিব, এমত আশা করি।

এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবেন, অনুষ্ঠানপত্রেই তাহা প্রচার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কলিকাতা।
আহিরীটোলা
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১৫ই আশ্বিন, ১২৯২সাল।

সূচীপত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ।

প্রথম খণ্ড।

নৈতিক এবং পরমার্থিক।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
সব হ্যায় ফাঁক	১
সবভরপুর	৩
কিছু কিছু নয়	৫
ঈশ্বরের করুণা	৮
সাম্য	২১
মায়া	২২
কাল	২৬
শরীর অনিত্য	২৮
রোজসই	৩০
তত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই	৩১
পরমার্থ	৩৭
সংগীত	৪০

বিষয়			পৃষ্ঠা।
প্রণাম তোমায়	...	...	৪৩
তত্ত্ব	...	...	৪৬
খল্ ও নিন্দুক	...	...	৫২
মিশনরি	...	...	৫৩
বিষয়ে সুখ নাই	...	...	৫৫
নির্গুণ ঈশ্বর	...	...	৫৯
শ্রীমদ্ভাগবত	...	...	৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক।

ইংরাজী নববর্ষ	...	...	৬৯
পৌষ-পার্ব্বণ	...	...	৭৪
ছদ্ম মিশনরি	...	...	৮১
পাঁটা	...	...	৮৩
বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি	...	...	৮৯
বড় দিন	...	...	৯১
নীলকর (৫ টি গীত)	...	...	৯৯

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দুর্ভিক্ষ (দুইটী গীত)	...	...	১২০
আচার ভ্রংশ	...	..	১৩২
বাবাজান বুড়া শিবের স্তোত্র	...	...	১৩৪

তৃতীয় খণ্ড।

ঋতুবর্ণন।

গ্রীষ্ম	...	...	১৫০
বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব	...	...	১৫৩
বর্ষার বিক্রম বিস্তার	...	...	১৬৪
বর্ষার ধূমধাম	...	..	১৬৬
সুবৃষ্টি	...	...	১৬৭
বর্ষার আবির্ভাব	...	..	১৭০
বর্ষার অভিষেক	..	..	১৭২
বর্ষায় লোকের অবস্থা	..	..	১৭৩
বর্ষার ঝড় বৃষ্টি	...	...	১৭৬
শরদ্বর্ণন	...	...	১৭৭

বিষয়			পৃষ্ঠা।
১২৫৫ সালে শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন	...	...	১৯৯
শারদীয় প্রভাত	..	..	২০৪
শীত	...	...	২১০
বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভ এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ...		...	২১৪
বসন্ত বিরহ	...	...	২২০

চতুর্থ খণ্ড।

যুদ্ধবিষয়ক।

শীক সংগ্রাম	...	..	২২১
যুদ্ধের জয়	..	..	২২৩
দ্বিতীয় যুদ্ধ	..	...	২২৭
মুদকির যুদ্ধ	..	..	২২৯
যুদ্ধ	..	...	২৩০
যুদ্ধের জয়	...	..	২৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
কাবুলের যুদ্ধ	২৩৮
ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম	২৪২

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিষয়ক।

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা	২৪৭
ভাব ও চিন্তা	২৫১
হাস্য	২৫৩
কালকন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ	২৫৬
গিরিরাজের প্রতি মেনকা	২৫৯
বর্ষার নদী	২৬৩
দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু	২৬৩
প্রেমনৈরাশ্য	২৬৮
প্রেম	২৬৯
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন	২৭০
প্রণয়	২৭৩
প্রণয়ের আশা	২৭৬

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব

বিষয়ক

প্রবন্ধ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব।

—০০০০০—

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য-রাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা

বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, যে এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগিরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগিরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে

যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতক গুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে

সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোট গুলি এরূপ পরিপাটী, যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোট গুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথা গুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য ও শিক্ষা।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথ-গামিনী হইয়াছেন। যে খানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্ব পারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমার হট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ।

---

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটী টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবি-ভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটী পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ, এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরষে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫ এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরা-পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈত্রিক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে

এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদহের কুটিতে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমবশ্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেরে?—কে যায়?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস?"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুঁড়িয়ার বসিয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বর চন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে,

বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কীরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালা-বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ

স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বর চন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখ্‌ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বর চন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে

সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠ-শালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈচরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্ব-দন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনায়, অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই

বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতিশীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড়

পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটী পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়া-

ছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পুজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদীদল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটী অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎ সমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।”

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র

সহবাস থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জম্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাবানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশ চন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে " মহেশা পাগলা " বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার সেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে— কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romance ও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটী পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের

বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতী-নের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর কন্যা দিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃগণ এ কথটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চির-কাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যু-কালে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎ-সর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাঁহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুণ তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের

সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষার ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

—— . ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠি-

তেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটী কিছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট"—১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) "সমাচার দর্পণ"—১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে "সংবাদকৌমুদী" প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে "সমাচার

চন্দ্রিকা", (৫) "সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্র মোহনের সাহায্যে উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "৺ বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺ বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺ বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৺ বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺ হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺ কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় * অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু
ক্বচিদ্ভ্রমং ভ্রাম মতভ্রমীরদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোন্তুদ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরাস্বাস্তদ্বিরেফারসং॥

পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।”

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাদক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেকস্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ

লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনা গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগ-শূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘা-চ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি

লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বর চন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে "সংবাদ রত্নাবলী" আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে

কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।”

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৪৩ সালের ২৭ এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণমঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাই লাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাল লাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটী করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতা দ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়ীত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।”

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমু-

জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম ;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপাল কৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাই লাল ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপাল চন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইহাঁরা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহাঁর সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইহাঁর মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৺নন্দালাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের

পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।”

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্য-কারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠা-ইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদ পত্র সমূহের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া লয়।”

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপীড়ন” নামে এক খানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত

হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাদ্রগুপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

. সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি একসংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়া ছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্য ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটী ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে

গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বর-চন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনি-বাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক, স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর সম্পা-দকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের

জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহা ছাত্রমণ্ডলির কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্পবয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, চুর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাট-ভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী—জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী--থানায় নিথাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে

বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ্ আখড়াই দল সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখেরদল সমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটী নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটী মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং

কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বর-চন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১ লা তারিখ হইতে এক এক থানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ

অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংশাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া,বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই থানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণ-সূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানা-বিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে

নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অবিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ক্রটী করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত " কালীকীর্ত্তন " ও " কৃষ্ণকীর্ত্তন " প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ

করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক-লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধপ্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিত-প্রভাকর" এবং "বোধেন্দুবিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিন খানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা "নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করি-

য়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টীই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয় ;—

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবি-কুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগা-ক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়া-ছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা

এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান: এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পর দিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুইপ্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ ভাগিরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই

পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্ত-গঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার

অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাব পত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লই-তেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকা-গুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুইবেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং

স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন, মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক; কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক(১)দুই(২)তিন(৩)চারি(৪)ছেড়ে দেহ ছয়(৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥

(১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য্য (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

তক্ক ছাড়া পঙ্ক সেই অতি পরিপাটি।
রাবুসেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এ জন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী-ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাবের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বারকাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান।

তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুইদল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি।"

আবার আজ কাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না, যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, যে তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা

উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন. ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এই খানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটা-পুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ

তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়েনা কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্য রস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপ্‌সেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এসমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি—তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া

দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার ;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত,তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময়

লজ্জায় মুণ্ড তোলন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নকুসা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐরকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই

জনে একটু হাসিবার জন্ত। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গেনা।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত—

গুড়্ গুড়্ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সখের বাবু, বিনা সম্বলে,—

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সেমাছ লইয়া আনন্দ—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে—

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা—

সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধি চোসার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন।

কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারিনা। ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম্—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর

গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাঁগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরূথে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না।

জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্ত তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ কার্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এই রূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত

সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটু খানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য-সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে

আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব

লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নাই। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা

কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার

পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্বাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা,—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান * সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটী স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতক-গুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সে গুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক গুলির মধ্যে ঐ কয়টী বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান্ ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাসী নামাবলীধারিতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা

বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাঁধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত। *

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে কালা॥

---

* এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহাঁরা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃ-প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আর ও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে,

উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

স্থূলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাসী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপ-

সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না

ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি।

এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত যোগেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম;—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ-রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগণে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কেরে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে বামা, ষোড়শী রূপসী
সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।

দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস॥ ১
কেরে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেলরে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি, নিকট মরণ, কররে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন

বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিবাক্‌ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান, ইবোলিউশন,

ভিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর-গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী", "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বরগুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও

চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃ সম মাতৃ ভাষা," সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি," এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃ ভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা

বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগুলি না

তুলিয়া, সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর," "বোধেন্দুবিকাশ," "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেননা সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

সমাপ্ত।

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত

কবিতাবলী।০

প্রথম খণ্ড।

নৈতিক এবং পরমার্থিক।

সব হ্যায়-ফাক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক্।
পোসাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, শোভা করে নাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক্ লাক্।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

সব ভরপূর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর, বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,

করহ ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চুর।
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল সদ্ম, পাইবে মধুর।
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগতচয়,
শীলতায় বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভাণ,
ভোগ যোগে রাখ মান, ছুঃখ হবে দূর।
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর।
ছুনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপূর॥

পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,

এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মঞ্জুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যশোযোগ,
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে ঊর্মি,
এ সব তেজিয়া তুমি, হইবে ফতুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

কুম্ভধারী নট মত, হর কাল অবিরত,
গৃহ কার্য্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

কিছু কিছু নয়।

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,

পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
কারে আমি বলি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।
কার বস্তু কেবা হরে, কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে,
বিষম বিষয় বিষে, কিসে সুখোদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কি হেতু সংসার-সূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল, নাহি কাল-ভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কবিতাসংগ্রহ।

কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়।
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

রমণী-বচন মদ, পান মাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, প্রফুল্লহৃদয়।
অবশেষ বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারে বল সুচতুর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপূর, ভরপূর নয়।
সুখ লাভ করিবার; বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা, ভার বোঝা নয়।
ভব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়॥

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

ঈশ্বরের করুণা।

অখিল সংসার, রচনা যাহার,
সেজন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে॥
এ ভব বিষয়, সব শিবময়,
শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব॥
অনাদি কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখ ভোগে,
মনের বাসনা যত॥
কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ,
বিষম বিলাপ হর।
করি অবধান, হোয়ে সাবধান
বিধান পালন কর॥

ভোগের কারণ, যাহা চায় মন,
সকলি রোয়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে?
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার ভরা।
নানা ফুল ফল, সুশীতল জল,
ধারণ করেছে ধরা॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিধির বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরম নিধি॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হোলে পরে।
শরীর রতন, অকালে পতন,
যতন কেহ না করে॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ় কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখী সেই যথা তথা॥
অভিমত মত, কাযে হোয়ে রত,
অবিরত চাল দেহ।

অভাব রবে না, অশিব হবে না,
কুকথা কবে না কেহ॥
সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোষে,
সুধা হয় বিষময়॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্ব চিত, সুজন সহিত,
সতত সুপথে চর॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ হেতু।
সার কথা এই, দুখ নয় সেই,
সমূহ সুখের সেতু॥
ভবে ভগবান, করুণানিধান,
বিধান করেন যাহা।
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশলপূরিত তাহা॥
শরীর ধারণে, সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু দুখ।
তাহে রহে সুখে, এক গুণ দুখে,
কোটি গুণে পাবে সুখ॥

যদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখ-সাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি, জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী॥
এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্ম ফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দুষিয়া,
মিছা করে অভিযোগ॥
আঁখিহীন নর, প্রভাকর-কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজ তাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে,
অথচ অযশ গায়॥
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই॥
এসে এই ভবে, জ্ঞানহীন সবে,
ভ্রমপথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, দ্বেষ করে তত,
নাহি বুঝে কোন ক্রমে॥
হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়,
একথা বুঝাব কারে।

যিনি নিরঞ্জন, অখিলরঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে॥
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি করে তাঁর নাম।
মনে কত ভূর, কহে কোরে সুর,
বড়া বাহাদুর হাম॥
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা।
রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে,
আমার সমান কেবা॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ॥
বটে বাপ্ দাদা, ছিল নামজাদা,
ভূষিত ভুবন ধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাদের নাম॥

কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত ছলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে. প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে?
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে?
সকলেই বস, ভবভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির নাজির,
বাদসার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
ড্যাম্ ড্যাম্ সব, মুখে নাই রব,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
"হুট" বোলে উঠি, "বুট" পায়ে ছুটি,
কেমন আমার ভাব।
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গোরুর জাব॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।

কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকর,
তাঁরে আমি নাহি মানি ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়,
কিসে হব পরাভব ?
টলে যদি রতি, মদনের রতি,
আনি এইখানে বোসে।
আমার প্রতাপে, ত্রিভুবন কাঁপে,
রবি শশী পড়ে খোসে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধপূরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥

গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ নাম, এই দেখ ধাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখ্‌মলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
এই দেখ জামাজোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপমোড়া।
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ,
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া ॥
দেখনা কেমন, চিকন বসন,
জাহাজে এসেছে সবে।

রাজা আমি যাই, তাই সিন্ পাই,
আর কি এমন হবে ?
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না,
এসেছে বিলাত থেকে।
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে,
আমার এ ঝাড় দেখে ॥
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা ?
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে ॥
শুনরে পামর, বোধহীন নর,
সকলি ভোজের বাজী।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় পাজী ॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া।
কোরোনা অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোড়া ॥

তোর টাকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি আল্‌বোলা।
মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাড়িয়াছে বোল্‌বোলা॥
কি বাজা বাজাবে, কি বাড়ী সাজাবে,
দেখিয়া ভবের সজ্জা।
কি কব অধিক, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌,
মনে কি হয়না লজ্জা?
বাড়াইয়া ভুর, সাজাইয়া পুর,
কাহারে দেখাবে শোভা?
বিনোদ ভুবন, দেখেছে যে জন,
সে জন হোয়েছে বোবা॥
এই তোর রূপ, হইবে বিরূপ,
ধূলায় পড়িবে দেহ।
মুদিয়া নয়ন, করিলে শয়ন,
সুধাবেনা আর কেহ॥
তোমার যে ঘর, এই কলেবর,
যেতে হবে তাহা ছাড়ি।
আপন ভুলিয়া, বাড়ি ঘর নিয়া,
এত কেন বাড়াবাড়ি?
এই মন প্রাণ, যে কোরেছে দান,
কর দেখি তাঁর ধ্যান।

যদি চাহ মান, রাখ পরিমাণ,
এত অভিমান কেন ?
মিছে বার বার, আমার আমার,
আমার আমার কহে।
সার হোলে ভূমি, তুমি নও, তুমি,
কিছুই তোমার নহে।
ভবে যত দিন, রবে তত দিন,
দীন হোয়ে দিন কাটো।
কুদিকে চেওনা, কুপথে যেওনা,
সুপথ দেখিয়া হাঁটো॥
কভু হয় সুখ, কভু হয় দুঃখ,
জগতের এই রীতি।
যখন যেমন, তখন তেমন,
প্রভু প্রতি রেখো প্রীতি॥
তাঁরে মন প্রাণ, যদি কর দান,
কভু না অশুভ ঘটে।
যাবে সব ভয়, সদা শিবময়,
বিরাজ করিবে ঘটে॥
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদ,
সার কথা কই কারে।
সুখ যতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ,
মনেতে করে না তাঁরে॥

একি পাপ রোগ, হোলে দুখ ভোগ,
অনুযোগ করে কত।
বলে " হায় হায় ,, ঈশ্বর আমায়,
সারিলে জনম মত ॥
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে,
উঠানের দেয় দোষ।
অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত,
কামারের প্রতি রোষ ॥
অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ,
তাহার চরণে গড়।
অধিক খাইয়া, উদর ফাঁপিয়া,
জননীরে মারে চড় ॥
না জানে সাঁতার, না পায় পাথার,
হাঁফ লেগে প্রাণে মরে।
না করি বিচার, সরোবর যার,
তারে তিরস্কার করে ॥
শুন হে চেতন, হও হে চেতন,
অচেতন কত রবে ?
জয় দাতারাম, পরমেশ নাম,
আর কবে ভাই কবে ?
পিতা মাতা তব, দেখালেন ভব,
করহ তাঁদের সেবা।

বাপ মার পর, আছে এক পর,
হিতকর আর কেবা ?
আর আর কত, পরিবার যত,
বিচরে ভারতভূমি।
যে জন যেমন, তাহারে তেমন,
ব্যবহার কর তুমি ॥
সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার,
যত পার তত কর।
অপরাধী জনে, ক্ষমা করি মনে,
তার অপরাধ হর ॥
পেয়েছ শ্রবণ, কর রে শ্রবণ,
পীযূষ-পূরিত কথা।
পেয়েছ চরণ, কর রে চরণ,
সাধুজন আছে যথা ॥
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন,
ভবের ব্যাপার সব।
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
কর হরি হরি রব ॥
পেয়েছ যে নাশা, সুবাসের বাসা,
করহ তাহার হিত।
পেয়েছ যে কর, বিরচন কর,
পরম প্রভুর গীত ॥

পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন,
কম্বলের দলনীর।
এখন তখন, কি হয় কখন,
কিছু নাই তার স্থির॥
তাই বলি শেষ, লহ উপদেশ,
হৃষীকেশ বলে যাঁরে।
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
পূজা কর তুমি তাঁরে॥
এ দিকে তোমার, দিন নাই আর,
বৃথা কেন দিন হর?
অভয় চরণ করিয়া স্মরণ,
জনম সফল কর॥

সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম॥
পরিমাণ করি মান, মান রাখ মানে।
সমানে সমানে সব, তবে লোক মানে॥
নিজ মান চাই স্বধু, কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী?
সরলতা কর যদি, সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে স্বহিত॥

লইতেছ পর ধন, বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না কর॥
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পর জ্ঞান, মা চলিলে পরে॥

মায়া।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হোয়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে॥
শিশুকালে একরূপ, সহজে সরল
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল॥

সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত॥
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ॥
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর, কিন্তু তায় না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার॥
পলিত কুন্তলজাল, গলিত দশন।
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ॥

কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায়॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গা যাত্রা হোলে॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্র জাল॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ॥
কবে ভূত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে॥
ভূতের বাসায় থাকো, দেখোনাকো চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে॥
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার।

অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্বজন ॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হলিঘোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যাঁর ॥
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন ॥

আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥
কিন্তু এক উপদেশ করি, অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥
দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরোনা কাচের সহ, কনকের তুল ॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা ॥

কাল।

অপরূপ এক পক্ষী. জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়. আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হোলো মেষ॥
এই ভেড়া হোয়ে ষাড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়,
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করী অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ॥

পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা-সুতা,
সিংহ-প্রাণ করিল হরণ।
একজন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন॥
তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,
এই ভাবে হইবে সঞ্চার॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব॥
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিম্বা রবে এক রব॥
তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ।

অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থির ভাবে রহ রহ রহ॥

শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভুতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়।
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,

দৃশ্য বটে মনোহর, পঞ্চভূতময়।

যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,

সুখদল হতবল, দুঃখের উদয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,

বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়।

ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর,

রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,

এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।

যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান-নেত্রে দেখ মায়া,

ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

আমি মুখে আমি কই ফলিতার্থ আমি কই,

আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।

দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,

মোহযুক্ত এ সংসার, ফক্কিকারময়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,

সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত রস,
পান করি লভো যশ, হবে কাল জয়॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারুহার, বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার,
আত্মারূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

রোজসই।

অহরহ, অহরহ, কত গত হয়।
এই অহ, এই রহ, লোকে এই কয়॥
রাত্রি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাল সমুদয়।
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচয়॥

দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট।
সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥
প্রপঞ্চ শরীর পেয়ে, যত দিন রই।
এই কাল এই আমি এই মাত্র কই ॥
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই।
কভু ভাবি, আমি আমি, কভু আমি নই ॥
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই।
ভবের খাতায় শুধু, করি চেরা সই ॥
বাজিল ছুটীর ঘড়ি, হলো রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই. কর হই হই ?
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই ॥
আমি বলি এই এই. তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পাবেনাকো থই ॥

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ।
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥
সুখের বাসনা যত, করি পরিহার।
নিরাহারে কভু থাকে, কভু নীরাহার ॥

ইচ্ছাধীন আহার না, চাহ কারো ঠাঁই।
এরূপ সাধনা করি, কোন ফল নাই॥
জলদের মুখ চেয়ে, গগণেতে থাকে।
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে॥
প্রাণান্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয়।
চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয়?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, বাসনাবিহীন।
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন॥
ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ॥
পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর।
উদ্ধার হইত কত, খেচর ভূচর॥
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথা ভ্রমে।
সুখ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রমে॥
লজ্জাহীন দিগম্বর, নিজ ভাবে রয়।
বনের গর্দ্দভ তবে, যোগী কেন নয়?

স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর।
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর॥
ঘৃণা হত, সুখে রত, স্বমত প্রচার।
কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার॥

যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা, করিছ ভক্ষণ।
ভক্ষণ কথন নয়, যোগের লক্ষণ ॥
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘুরিয়া।
যাহা পায়, তাহা খায়, উদর পুরিয়া ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে, ঘৃণা নাহি হয়।
শূকর শূকরী তবে, যোগী কেন নয়?

শরীরের সমুদয়, লোমকুপ ঢেকে।
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভস্ম মেখে ॥
বড় ছটা ঘোর ঘটা, ভজনার জাঁক।
মাঝে মাঝে উচ্চ রবে, ছাড়িতেছ ডাক ॥
ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে, হারায়েছ দিশে।
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে
ভস্মমাখা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
ভয়ে কাঁপে থর থর দেখে যত নর ॥
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভস্ম মাঝে রয়।
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়?

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে।
দুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে ॥
জল আর তৃণফল, করিয়া আহার।
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার ॥

সমভাবে সহ্য কর, সকল সময়।
তপস্বীর এই যদি, সত্যধর্ম্ম হয়॥
তৃণ জল খায় শুধু, কাননে বসতি।
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি॥
শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র জল, সহ্য সমুদয়।
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয়?

শিবদুর্গা তারা রাম, বলিতেছ সুখে।
সদা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ মুখে॥
দেবদেবী নাম সব, মনে পড়ে যত।
উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ, কর তুমি তত॥
লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্তব পাঠ করি।
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিন্ধু-তরী॥
কৃষ্ণ রাম মুখে বলি, মুক্ত হলে পর।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর॥
রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা সদা মুখে কয়।
শুক আর শারী তবে, যোগী কেন নয়?

মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেক।
ছুটী ভাই প্রভুপ্রেম, সুখে অভিষেক॥
সঙ্গতের সঙ্গগুণে, পঙ্গতে বসিয়া।
অধর-অমৃত খাও, রসিয়া রসিয়া।

পত্রে পত্রে এক করি, প্রভুপ্রেম যাচ।
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ॥
আহার দেখিলে পরে, সন্তোষিত থাকে।
লাঙ্গূল বিস্তার করি, মেও মেও ডাকে॥
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয়।
গৃহীর বিড়াল তবে. যোগী কেন নয়?

রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত।
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত॥
শিষ্টবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব।
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব॥
নাসিকায় চিত্র করা, তাহে রসকলি।
গলায় ত্রিকণ্ঠি বান্ধা, গায়ে নামাবলী॥
ছাব মেরে ভার জারি, তাহে কিবা ফল।
তিলক কুতলি নহে, মুক্তির সম্বল॥
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়।
ময়ুর ময়ুরী তবে, যোগী কেন নয়?

পূজা, হোম, যজ্ঞ, যাগ নানারূপ ক্রিয়া।
গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোষাকুষি নিয়া॥
ফুল তুলি স্নান করি, পূজায় নিবেশ।
মালীর মালঞ্চ সব, করিয়াছ শেষ॥

পিতলের গোপালের, পরম আদর।
নির্ম্মাণ করহ শিব, কাটিয়া পাথর ॥
লইয়া পিত্তল খণ্ড, মাথাও চন্দন।
মনে মনে ভাব তায়, নন্দের নন্দন ॥
ঘাঁটিয়া প্রস্তর কাঁসা, যোগী যদি হয়।
কাঁসারি ভাস্কর তবে, যোগী কেন নয় ?

সুখ দুখ কিছু মাত্র, বোধ নাই মনে।
সমভাবে একা তুমি, বাস কর বনে ॥
দিবানিশি ধরাসনে, মুদিয়া নয়ন।
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে, সুখেতে শয়ন ॥
গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র একা।
মানুষের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা ॥
এরূপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে।
সিদ্ধ হয়ে বিভু পায়, ভ্রম মাত্র মনে ॥
নিয়ত নির্জ্জন হয়ে, বনবাসে রয়।
ভল্লুক শার্দ্দূল তবে, যোগী কেন নয় ?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ।
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্ম্মের আভাস ॥
বাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল।
বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল ॥

ধর্ম্মের সূচনা করি, নাম হলো জারি।
নানারূপ গীত বাদ্য, আড়ম্বর ভারি॥
সাধনায় সাধুভাব, স্বভাবে সরল।
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল॥
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয়।
নটী নট, যাত্রাকর, যোগী কেন নয়?

পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেম-বলে জগতের প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই॥

প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে॥

দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা, উহু, করেনাকো মুখে॥
সহজে কি প্রেম কোরে তারে পারি বোকা।
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে খোকা॥
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্ ধোঁকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম-পোকা॥

ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লোয়ে॥
পেট নিয়া, দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কিরে বাপু?
ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু, ঘরছাড়া, অনুচিত নয়॥
বোসে থাকো এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া॥

কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে?
এ ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে?
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল?
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল?

কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ?
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয়॥
শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা রয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয়॥
অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পথ॥
গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার?
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময়॥

•

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়?
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়।
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায়?

এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥
ভূতে করে হাড় গুঁড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ?

মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা বেচা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কাণ ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ?

-*-

সংগীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে।
কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার হে ?
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,

সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে।
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে ॥
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥
কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ,
তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে ॥
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে ॥
অচল সচলচয়, রূপ শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে ॥
কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে স্থূল,
ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে ?
না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে ?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভাব ধরিলাম,

কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে॥
ভয় করি পর-ক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে॥
আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে॥
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখনো রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি, কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে॥
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে॥
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে সোর, চোর অহঙ্কার হে॥
যতদিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে॥
বপুবাসে রিপুদল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে।
থাকিতে সরল সোজা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে॥
আমায় দেখিয়া দীন, এখন সুদিন, দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে॥
গত যত হয় ভাবী, ততই ভাবেতে ভাবি

সেরূপ ভাবের ভাবী, কবে হব আর হে ॥
গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে ॥
দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর ধাম,
ঈশ্বর তোমার নাম করিয়াছি সার হে ॥
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেনা ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে ।
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥

প্রণাম তোমায় ।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা ।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব ।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব ॥
তরুণ তপন হরে, তরল তামস ।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর ।
খরতর কর কর হন, দিবাকর ॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি ।

দিন যত গত, তত, দীন দিনপতি ॥
পরিশেষ পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি. এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ ॥
মাজে মাজে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া ॥
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তায়।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥

নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি।
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ, এই রস, এই আছে রব॥

এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সর্ব।
এই এই, আর নেই, পরে এই শব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন॥
এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান।
ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

তত্ত্ব।

কলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর।
ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর॥
পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ।
একবার কেহ নাহি, করে দরশন॥

কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীব।
কখনো করে না মনে, আপনার শির॥
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয়।
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয়॥

নিজ জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয়।
জ্ঞানহীন যত জীব, পশু সমুদয়॥
প্রাতে করে মল মূত্র, সবে পরিহার।
দিবা দ্বিপ্রহরে করে, সবাই আহার॥
নিশিতে * * * পরে নিদ্রাযোগ।
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ॥
নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে?

আপনার দেহ আর, আপনার দারা।
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী যারা॥
সে বড় বিষম নহে, কঠিন তো নয়।
স্বভাবের ধর্ম্মে তাহা, সহজেই হয়॥
ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই।
পরতন্ত্রপরায়ণ, দেখিতে না পাই॥
জ্ঞানীরে মানুষ বোধে নমস্কার করি।
মাথায় মুকুতা-হার, সেই করী করী॥

ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারূপ বেশ ধরে, দাম্ভিকের মত ॥
কভু দুর্গা, কভু শিব, কভু বলে হরি।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥
বাক্‌সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানায়।
কাগী, বগী, ভস্ম করে, কথায় কথায় ॥
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে ॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে ॥
সংসারের যত ধর্ম্ম, সকলি সে ধরে।
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে ॥
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয়।
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন।
কর্ম্ম আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন ॥

শ্রুতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে ?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কূপে।
উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥

একেতো অধীর অন্ধ, তাহাতে বধির।
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির॥
করিয়া পরম্পথে, কণ্টক প্রদান।
শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সন্ধান॥

বদ্ধ করি বাক্যব্যূহ কাব্য অলঙ্কারে।
পুরাণাদি শাস্ত্র শস্ত্র, রাথে ধারে ধারে॥
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে।
কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে॥
বচনের সূত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায়।
পরম ভাবের ভারে, অভাব ঘটায়॥
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার।
শাস্ত্রের সম্ভাব ভেঙে, একে করে আর॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম্ম নাহি লয়।
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয়॥
বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ॥
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ত্ব লয় তার।
অবোধে কি পাবে তত্ত্ব, তত্ত্ব কোথা তার?
শব্দবোধে শুধু হয়. বিদ্যার প্রকাশ।
সংসারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ॥

কোন নর কোটি বর্ষ, বেঁচে যদি রয় ।
তথাপিও শাস্ত্র পোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥
কত গুণ সম্ভাবনা, হয় একাধারে ।
শাস্ত্ররূপ সিন্ধুপারে, কে যাইতে পারে ?
কর কর যত পার, শাস্ত্রের আলাপ ।
কিন্তু তায় মন যেন, না দেখে প্রলাপ ॥
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই ।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই ॥

আয়ুহর বিঘ্নকর, শাস্ত্র সমুদয় ।
সমুদয় শাস্ত্র পোড়ে, জ্ঞান কার হয় ?
শাস্ত্র পাঠে নাহি হয়, মালিন্য মোচন ।
কখনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ ॥
বিদ্যা কিছু অন্তরের আঁধার না হরে ।
মুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে ॥
শাস্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না বন্ধন ।
মুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন ॥

বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি ।
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি ॥
অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তি লাভ যার ।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার ॥

পঁইজেতে সমুদয়, দৃষ্টি যেই করে।
বৃদ্ধ হোলে সে কখন "চসমা" না ধরে॥
হেঁটে না হোঁচোট খায়, চলে যেই তেজে।
সে কি কভু যষ্টি ধরে, যষ্ঠীবুড়ী সেজে?

প্রেম আর ভক্তি হয়, সর্ব্বমূলাধার।
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার॥
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সঁপেছে মন।
সে কি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন?
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয়।
কোনমতে বাহ্য তার, গ্রাহ্য আর নয়॥
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন॥

খল ও নিন্দুক।

মহৎ যে হয় তার, সাধুব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই, মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

মিশনরি।

যথার্থ যে মূলধর্ম্ম, স্বতন্ত্র তাহার মর্ম্ম,
কর্ম্ম হেতু নাহি যায় জানা।
নানা জাতি নানা মত, উদ্ধারের নানা পথ,
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ নানা॥
পরমেশ কৃপাময়, এক ভিন্ন দুই নয়,
সবার উপাস্য হন যিনি।
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ,
সকলের ত্রাণকর্ত্তা তিনি॥
এই যে অখিল বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ।
প্রকাশিয়া অনুরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,
সৃজিল মনুষ্য বহুরূপ॥
যত দেখ ছিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-চিহ্ন,
তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদয়।
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,
কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল,
শুন ভাই মিশনরি মন।

শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে,
দ্বেষাদ্বেষে নাহি প্রয়োজন ॥
আপনার মত যাহা, স্বজাতি সমীপে তাহা,
ব্যক্ত কর ঈশুগুণ গেয়ে।
বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর,
হিঁদুদের পরকাল খেয়ে?
জুসজাতি সুনিপুণ, তারা জানে ঈশু-গুণ,
কোরাণে যবন নাশে খেদ।
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে,
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ ॥
শাস্ত্রবল বাহুবল, উপদেশ যত বল,
যুক্তিবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে।
সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব,
সেই নিত্য নিয়ন্তা নিকটে ॥

—*—

বিষয়ে সুখ নাই।

জন্মিলে মানুষ একা. সঙ্গী নাই কেহ ।
কেবল আপন প্রতি, আপনার স্নেহ ॥
একের ভাবনা মাত্র, একরূপ বলে ।
মানুষের স্বভাবেতে, দুই পদে চলে ॥
দ্বেষ-রাগশূন্য মন, ক্ষুণ্ণ কভু নয় ।
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় ॥
সুখেতে ভ্রমণ করে, সন্তোষের বনে ।
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় মনে ॥
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীরে ।
দ্বিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে ॥
মনে হয় সার বোধ, অসার সংসার ।
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আর ॥
রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফাঁদ ।
সংসার-সাগরে বাঁধে, বিষয়ের বাঁধ ॥
পূর্ণশশী সম শোভা, যুবতীর মুখে ।
ঘোর ক্ষুধা সুধা ভ্রমে. বিষ খায় সুখে ॥
" স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়করী " শাস্ত্রে এই বলে ।
চতুষ্পদ পশু প্রায়, চারি পায় চলে ॥
অর্থের কারণ হয়, উপার্জ্জনে মন ।
নানা ছল প্রতারণা, করে অন্বেষণ ॥

বোধহীন সদা ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ।
দারুণ দুঃখের দশা, প্রাপ্ত হয় শেষ॥
জন্মিলে সন্তান হয়, অন্য প্রকরণ।
তৃতীয় দেহের চিন্তা, উদয় তখন॥
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল।
অকূল চিন্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কূল॥
চতুষ্পদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয়।
পশু ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয়॥
ভ্রমময় মায়াসূত্রে, যুক্ত একেকালে।
উর্ণনাভি* বদ্ধ যথা, আপনার জালে॥
এইরূপে ক্রমে যত, বাড়ে পরিবার।
মস্তকে ততই পড়ে, সংসারের ভার॥
তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয়।
কোনরূপে নাহি রহে, কোনরূপ ভয়॥
সমুদ্র লঙ্ঘন করি, অভয় অন্তরে।
অনাসে ভ্রমণ করে, দেশ দেশান্তরে॥
বহুকষ্টে যদি কিছু, উপার্জ্জন হয়।
নানারূপ বিড়ম্বনা, ভোগের সময়॥
রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস।
নতুবা শমন করে, জীবন বিনাশ॥

---

* উর্ণনাভি—মাকড়সা।

যদ্যপি জীবিত ভাই, থাকে সেই জন।
সুখের আস্বাদ নাহি, পায় তার মন॥
পরিবার মধ্যে নহে, সকল সমান।
পরস্পর মনে মনে, মহা অভিমান॥
যখন যাহার মনে, তুষ্টি নাহি হয়।
তখনি অমনি তার, মলিনহৃদয়॥
এইরূপে জর জর, বিষয়ের বিষে।
বিষয়ী পুরুষ তবে, সুখী হবে কিসে?
সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার।
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অগ্নিভয় আর॥
চোর-ভয়ে, রাজ-ভয়ে, ভীত প্রতিক্ষণ।
কিরূপে মানব পায়, সুখের আসন?
বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান।
দ্বেষ, হিংসা সমুদয়, হয় বলবান॥
জ্ঞাতিদ্বন্দ্বে অর্থনাশ, রাজার সদনে।
কদাচ না দেখে মুখ, দয়ার দর্পণে॥
চিরকাল রব আমি, এই ভ্রম ধরে।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না করে॥
সংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান।
আনন্দ অন্তরে তার, নাহি পায় স্থান॥
পরিজন কেহ হোলে, কুকার্য্যেতে রত।
তখনি লজ্জায় তার, হয় মুখ নত॥

হইলে পুত্রের পীড়া, কতই জঞ্জাল।
প্রতিদিন প্রাতে উঠে, পাঁচনের জ্বাল॥
ঔষধ পথ্যের তরে, চিন্তায় মোহিত।
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ, বৈদ্যের সহিত॥
মরিলে সন্তান হয়, পাগলের প্রায়।
শোকে সব বল বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায়॥
মায়ামদে মত্ত হোয়ে, মনে শোক আনে।
কার পুত্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, দুঃখে হরে কাল।
মোহকূপে মগ্ন হোয়ে, যায় পরকাল॥
হে বিভো করুণাময়! দূর কর খেদ।
মহামায়াজালপাশ, সব কর ছেদ॥
বিবেক, বৈরাগ্য দুই, এ ঘোর সঙ্কটে।
নিয়ত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে॥
দয়া, ধর্ম্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত।
করুক্ বিপক্ষদলে, সংগ্রামেতে হত॥
মিথ্যা, রাগ, প্রতারণা, শত্রুকুল যারা।
খরতর জ্ঞান-অস্ত্রে, সব হবে সারা॥
জগতে কেবল হয়, সত্যের প্রচার।
মিথ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর॥
ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদয়।
একমাত্র সত্য তুমি, বোধ যেন হয়॥

তুমি সত্য নিত্যরূপ, এই জানি সার।
আত্মারূপে বিরাজিত, হৃদয়ে আমার।
যেমন তেমন তুমি, বিফল বিচার।
মনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার॥

নির্গুণ ঈশ্বর।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার, তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব লোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা!
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা।
কাণ্ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আশ্বাস?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ।

কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয়?
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয়॥

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন॥
চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা॥
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ॥
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে দাঁড়াইব আর?
উঠ উঠ, মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে?
অনুভবে বুঝিলাম, কাণা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে?
দর্শনেতে এত যদি না হইত দোষ।
নিরত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ॥

আবার কি সর্ব্বনাশ হোয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ!

চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর?
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥
আপনিই যদি তুমি, পোড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়।
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়?

গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ?
পিতা হোয়ে যদি নাহি পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ?
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥
কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥

শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভব-কর, কিন্তু নাই কর্॥
এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব, করে যেই।
বিশ্বকর বিভু হোয়ে, করহীন সেই॥
যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কব।
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই ভব?
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর॥
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে॥
যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে।
নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে?
পাটা নিয়া, যে ভুমি, দিয়াছ তুমি নাথ।
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত॥
তাহাতে অসার মাটি, কাঁটা বনময়।
কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরাতো নয়॥
কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে।
অঙ্কুরিত হোলে তরু, কাটে কাম- কীশে॥

সুবিচার নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয়।
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয়॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি।
জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি॥
করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন্ ভাবে।
আঁখির নিমিষে ধোরে, বেঁধে নিয়ে যাবে॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ সার॥
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার॥
পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর॥
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আমি দিই কর॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাকো।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো॥
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও।
প্রেম তূলি, তুলি তাহে, ভক্তি রঙ্গ দিয়া।
হৃদিপটে তব রূপ রাখিব লিখিয়া॥

মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ।
তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ॥

শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব॥
গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ॥

তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস॥
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া।
বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়া॥
ঝরী ধরি, বজ্র বারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিয়ত মারে, নিশির নীহার॥
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয়।
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয়॥
পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হোলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি॥

অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ।
মূক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বোলেছে তারা॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, " হাবা আত্মারাম "॥
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড়্ নেড়ে, স্বায় দিও তায়॥
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হওনা বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেও মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥

পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধোরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বোসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে।
গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥
আছি গুপ্ত, পরিশেষ গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে?
গুপ্ত হোয়ে যথন, মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ।

প্রথমাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বদৃগোচর॥
এই জগতের, "সৃষ্টি", "স্থিতি", আর "ক্ষয়"
নিরূপিত নিয়মিত, যাহা হোতে হয়॥

সৃজিত পদার্থ সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হোতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর, "আকাশের ফুল"।
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"নিজজ্ঞান" স্বতঃ "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বস্বধন", সর্ব্বমূলাধার।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার"॥
বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের" মহিমা না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয় আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে, সে "বেদ" প্রকাশে॥
"তেজ" "জল" "কাচ" এই তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে" সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে॥
"বিকার বিশিষ্ট বোধে" "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক "অসত্য" সে, "সত্য" নয় নয়॥
"ত্রিগুণের" সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার॥
"সত্যরূপে" বোধ হয়, অখিল সংসার॥

ফলত "অলীক" এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র "তিনি" বিনা, "সত্য" কিছু নয়॥
"যিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"যাঁতে" নাই, কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চার॥
সেই "সত্য" "স্বরূপ" বিকার নাই "যাঁর"।
"পরম পুরুষ" তিনি, ধ্যান করি "তাঁর" ॥*

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।)

---

* কবি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটী এই :—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

অতি বাহুল্যভয়ে টীকা দেওয়া গেল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক।

ইংরাজী নববর্ষ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥ *
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত।
একান্ন একান্নে ছিল, সবার সহিত ॥
নিরন্ন বায়ন্ন দেব, ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম ॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর ॥

---

* চাঁদ ১ বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর ॥
মানমদে বিবি সব, হইবেন্ ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস্, ফুটিকাটা ড্রেস্ ॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাথা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা ॥
চিকন্ চিরুণি চারু, চিকুরের জালে।
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে ॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মৃদুহাস্যভরা।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধাহরা ॥
গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক্ ॥
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি।
রিবিণ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি ॥
ঢল ঢল টল টল, বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে ॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধন্য তুই মাচি।
তোর মত গুটি দুই, পাখা পেলে বাঁচি ॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি, দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া ॥

উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি, বগির উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি, করি খুব.ভুল।
এঁটো করা সেরির, গেলাসে দিই হুল॥
কখনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায়, পাখা নাড়ী সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন, আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা॥
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্, টুক্ টক্ টক্।
ঠুনো ঠুনো ঠুন্ ঠুন্, ঢক্ ঢক ঢক্॥
চুপ্ চুপ্ চুপ চুপ, চপ্ চপ্ চপ্।
সুপ্ সুপ্ সুপ সুপ, সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্॥
হিপ হিপ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস॥

সুখের সখের খানা, হোলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান॥
গুড়ু গুড়ু গুম গুম, লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা, লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক।
যত পার কোঁসে খাও, টেক টেক টেক॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা॥
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে।
পেট পূরে খাও লোভ, যত সাদ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম!
সিন্দূরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্কি।
নস্নী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥

ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে?
ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে, খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো॥
পূরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ॥*

---

* এই কবিতার এবং পরবর্ত্তী কবিতার অনেকগুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পৌষ-পার্ব্বণ।

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা ॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্ ॥
সারানিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি ॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী ॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে ॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি ধামা ধামা ॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদেয় নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার ॥
তুক্ তাক্ মন্ত্রতন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল্, শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ ॥
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি ॥
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া ॥

চেয়ে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে, নয় রেথ চেলে ?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে ঢেঁকি।
আড় করি পার্ দিতে, সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয়, আদ্ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই কোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে॥
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মণ॥
একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি।
একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পূরোমণ, মন যদি খোলে।
পূরোমণে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা।
জাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা ?
কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো দায়।
খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায় ?
বিষম দুরন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা॥

না দিলে, ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুঁড়ি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব, মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল, পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায়, অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ্ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে।
দিবেনিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা, খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি, আমি যাই মেয়ে॥

এইরূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর।
গিন্নির কাঁড়ুনী হয়, কর্ত্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল্ ঝোল্ মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শ্বাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে;
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর ধনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু, মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখ খানি, অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া॥

হ্যাগা দিদী এই শাক, রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্তি বল, ভাল লাগে খেতে॥
দিদি দিদি কেন কোন, হেন কথা কোয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধুমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
স্বামির খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে।
বেঁসে বেঁসে বসে গিয়া, আসনের কাছে॥
খাও খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে রাকামুখে, পিটে দেয় পিটে॥

আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন্, চুকুলির ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে, কাণ হলো কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড়॥
মনোদুখে প্রাতে আজ, কুটি নাই থোড়।
এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোড়॥
শ্বাশুড়ী আলাদা রেখে, ছাঁই তিন হাঁড়ী।
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্যাটির বাড়ী॥
ঠাকুর্ঝির ছেলে গুলো, খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে॥
মরি মরি ঘাট্ ঘাট্, কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেটপূরে, নাহি পায় খেতে॥
শক্তিভক্তিপরায়ণ, হন যেই নর।
তখনি এসব বাক্যে, ভেঙ্গে দেন ঘর॥
উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ, গোটা দুই খেলে॥
কামিনী-কুহকে পড়ি, খায় যেই তাবা।
নিজে সেই হাবা নয়, হাবা তার বাবা॥
বুকে পিটে গুড়পিটে, গুড় পিটে গড়ে।
ছিঁদুর দেবতা সব, টাট্ তার ধড়ে॥

ভিতরে পুরিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা।

* * *

লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি।
গৃহিনীর অনুরাগে, শুষ্ক তাই চুষি॥
যুবো সব সুবো প্রায়, থুবো নাহি নড়ে।
কাছে বোসে খায় কোসে, রোসে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে।
ছুট নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥

ছদ্ম মিশনরি।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে, তারে কিবা ভয় ?
মণি মন্ত্র মহৌষধে, প্রতীকার হয় ॥
মিশনরি রাঙ্গা নাগ, দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষদাঁতে, সেরে ফ্যালে তারে ॥
ব্যাঘ্র-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে ?
হেদো বনে* কেঁদো বাঘ, রাঙ্গামুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে, নাম শুনে তার ॥
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে ॥
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥
মাতৃমুখে জুজু কথা, আছি অবগত।

---

* হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ, এই অর্থ।

এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গামুখ যত ॥
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান।
কাণকাটা * * * কেটে নেবে কাণ ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে।
বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে;
বাপধন বাছা মোর, ছেড়নারে ভিটে ॥
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয়, যেওনারে বাছা ॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক, ধর্ম্মপথ ধরে।
কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে ॥
হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার, মিশনরি যত।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া-ধর্ম্মহত ॥
পিতার সুখের নিধি, তনয় রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার, মনের মতন ॥
শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয়, সাধের কুমার ॥
বাক্যের কুহক যোগে, ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥
কামিনীর কোলশূন্য ক্ষুণ্ণ মন তায়।

এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায় ॥
বিদ্যাদান ছল করি, মিশনরি ডব।
পাতিয়াছে জাল এক, বিধর্ম্মের টব ॥
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব্।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা, জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় টবে ॥

—※—

পাঁটা।

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার ॥

---

* কবি ভ্রমণকালে আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া, পরে একটী পাঁটা পাইয়া, তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্ব্বক এই প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভোরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
জ্বাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লোয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে কেলি, হাড়গিলে হোয়ে॥

মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস ॥
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদনহত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত ॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মোরে যেন ছাগী-গর্ব্ভে জন্ম লয় তারা ॥
দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান ॥
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান ॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হোয়ে ॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাছে ॥
কিন্তু মাচ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয় ॥
এক দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥

পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি ॥
টুকি টাকি টুক্ টুক্ মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥
সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজা ॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ॥
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হোতো আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী ॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাঁই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে ॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হোয়ে ॥
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥

প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা * * ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলীর দেবল হোয়ে কালী-গুণ গায়॥
প্রণমামি * * তোমার চরণে।
পেটভোরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী॥
প্রণমামি কলীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা॥
নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে।
ভালকোরে ছোপাইব রুধিরের জলে॥
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব॥
ফের যদি করে দ্বেষ হোয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামি রোগ দিয়া ছাগনাদী॥

অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥
হায় একি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥

হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে দুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে ॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন ॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে ॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি।

যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি।
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি ॥
পাতিয়া কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ?
গাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে।
বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে ?

তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর, মাল্‌সাভোগ ফেলে ?
হিন্দু হয়ে কেন চল, সাহেবের চেলে ?
উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥
ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম্ম-ডোবার জল, খেয়োনা হে ভায়া ॥
যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়।
আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাই ভয় ॥
কত কারখানা করে, খেতে দিব খানা।
গোটুহেল ডোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা ?
সরপোটে বোসে খাব, খুসি মেরা খুসি।
যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগা ঘুসি ॥
আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে ?
ধর্ম্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মসভা আছে ॥
আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং।
টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয়া রিং ॥
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে।
পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে ॥
জ্ঞান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়া রূপ গণ্ডী।
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী ?
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও, যিশুমত খণ্ডী।
হাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা, ঘরে আয় চণ্ডী ॥

বড়দিন।

(দ্বিতীয়)

খ্রীষ্টের জনমদিন, বড় দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥
কেরাণী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট॥
ভেট্‌কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে॥
ও গড্‌ ও গড্‌ গড্‌, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরষের ছেলে?

এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে!
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয়॥
দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার মাহু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাহু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব তার সব গুণ, অবতার বোলে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই।
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ॥

তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে অহ্লাদ পান, যত মিশনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ!
ভুবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলিহারি তোরে॥
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ্চে গিয়া, দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল॥
মিলিটরি, সিবিল, বণিক আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটী, আস্ফালন কত॥
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে॥

বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেণ্ট ধরি॥
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্ হুট॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটরি, যত সব গোরা।
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে॥

ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক্ হোয়ে মুখ খানি, লুক্ করি সুখে ॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্।
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥
সাজিয়া কউচ্ম্যান, উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥
আন্দ্রুস্, পিন্দ্রুস্ আদি, ডিক্রুস্, মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস
জেস্থু, নেস্থু, কেস্থু আর, টেঁসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥
পোরে ড্রেস, হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥
পুঁইখাড়া চিংড়িড়ির, কোরে ভুষ্টিনাশ।
ম্যাম্ সঙ্গে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ॥
চুণাগলি অধিবাস, খেলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি।
লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটিব বেঙালি ॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই।
রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥

তেঁতুলে-গদী যেন, ফিরিঙ্গির ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাঁক।
আনাক্যাষ্ট কন্‌বর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হুলু, হিরু।
গনু, খনু, হনু, তনু, হারু, আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা।
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া।
ঈশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের পঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥
বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা॥
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা॥

ফ্লেস্-ডিস্-ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতে ভাত।
সে পাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা।
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা।
উরি মধ্যে দুঃখিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে।
তত্বহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে॥
ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্‌পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে॥
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-পাদা, ডেক্সের্ উপরে॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে॥
ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস" সেলর সকলে॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায়?
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায়॥

প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু-পাতে॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই॥
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে॥
ছেড়োনা ছেড়োনা আর, বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁদুয়ানি॥
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই॥
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ॥

—o—

নীলকর।

প্রথম গীত।

(কবির সুর।)

মহড়া।

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর্ নাহি পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন্ স্বোণার্ বর্ষে, থাসের্ বর্ষে,
কেবল বর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ী,
করুণাচক্ষে দেখনা॥
নামেতে নীলের্ কুটি, হতেছে কুটি কুটি,
দুখীলোক্ প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্‌ধপে বাইরে শাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।

ওমা একে মজার ফোঁসফুঁসুনি,
ধুনোর গন্ধ তায়।
হোলে চোরের কাছে ধর্ম্ম-কথা,
মর্ম্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন।

হোলো নীলকরের্‌দের অনরিরি
মেজেষ্টরি ভার্‌।
কুইন মা, মা, মাগো।
হোলো নীলকরের্‌দের অনরিরি
মেজেষ্টরি ভার্‌।
পড়েছে সব পাতর্‌ বক্ষে, অভাগা প্রজার্‌ পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইকো আর্‌।
নীলকরের্‌ হদ্দ নীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী,
বানরের্‌ হাতে হোলো কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হোলো ডাইনের্‌ কোলে ছেলে সোপা,
চীলের বাসায় মাচ।
হবে বাঘের্‌ হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না॥

অন্তরা।

প্রজা খোচ্ছে আর সাচ্ছে তারা এককাটে
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোড়া।
কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া॥

চিতেন।

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনকালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস্॥
যেন্ রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

অন্তরা।

চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ,
দোহাই না শুনচে একটী বার।
নীলের দাদন্, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁদন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥

চিতেন।

তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা,
সয়না অত্যাচার।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার্ পড়ে মারা,
লাটের্ দিন খাজনা হয় না আর।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ।
পূজি তোমার্ শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ সিঁদুরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা॥

দ্বিতীয় গীত।

(কবির সুর।)

মহড়া।

ভাল কার্য্যটী ধার্য্য করেঁ যদি গো,
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস।
এসে এদেশেতে বসৎ কর, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের্ চাষ।
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,
সন্তানের পূরাও অভিলাষ॥
হল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কারো নাই।
দোহাই, মা, তোমার দোহাই।
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,
তবেই রক্ষা পাই।
নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা,
জালায় নাইক জল।

আবার পোড়া ভাগ্‌গি, সকল মাগ্‌গী,
উপবাসে উপবাস॥

চিতেন।

তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে।
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে॥
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুঝে তোমার লীলে?
নিলে মা এই ভারতের ভার।
পেয়ে শুভ সমাচার।
মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো,
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,
ভেদ রবেনা আর॥
যত নীলের শাদা, মুলুকচাঁদা, শাদা কেহ নয়,
কোরে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
মনে কালী হয় প্রকাশ॥

অন্তরা।

না বুনলে নীল, মেরে কিল,
"কিল" করে, নীলকরে!

দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন্ তাদের,
হর্ত্তা কর্ত্তা কোরে।
জোরে বেঁধে আনে ধোরে॥

চিতেন।

যেমন কাজীরে সুধালে পরে, হিঁদুর পরব নাই,
তেম্নি সব নীলকরের্ আচার্, বিষম বিচার,
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।
একেতো মাগ্গি গণ্ডা, লুটেল তায় কুটেল ষণ্ডা,
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাচ্ছা লয়।
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা,
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,
এখন্ মা, প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গরু জরু, তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,
সমান কষ্ট বারমাস॥

তৃতীয় গীত।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

"বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—সুর।

ওমা কুইন্ তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম্,
কুইন কোরোনাকো।
যদি স্বোণার ভারত, খাস্ কোরেছ,
বাস্ কোরে, মা, থাকো থাকো।
শাস্ত্রে বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে স্বোণা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে রবে সব।
চারিদিকে উঠচে শুধু, জয় জয় জয় রব।
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে বলে ডাকে ডাকো॥
বঙ্গবাসী আমরা যত,
অনুরত অনুগত,
অবিরত করি কত,
শুভ বাসনা।

জয় জয় জয় বিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা।
"চোরে থেকো দোয়া গরু"
এমন্ কোথাও পাবেনাকো ॥
অন্নবিনে ঘরে ঘরে,
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।
দিনান্তরে উদরপূরে অন্ন মেলা ভার।
দুখী যারা, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো ॥
যে আগুণ লেগেছে চেলে,
চলেনা কেউ নিজ চেলে,
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে,
ভাস্যে দিচ্ছে চাল।
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল?
কিছু দিন মা! দয়া করি,
রপ্তানিটি বন্দ রাখো ॥
বঙ্গবাসী শত শত,
বিদ্রোহেতে হোলো হত,
পরিবার ছিল যত,
ধনেপ্রাণে হল কাঙালী,

বিনে বাঁচিনে, আম্‌রা ভেতো বাঙ্গালী।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,
চেলের জাহাজ চেলোনাকো॥
নূতন চেলে হবে শস্তা,
ঘটিল তার কি অবস্থা,
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,
কাঁটা হয়না রোধ।
চার মণের দাম্ এক মণে লয়,
মণের মনে ক্রোধ।
মনের চেলে মন ভেঙেছে,
ভাঙা মন আর গড়েনাকো।
পেয়ে নব রাজাদেশ,
নীলকরেতে শাসে দেশ,
নাহি মানে উপদেশ,
না করে উদ্দেশ।
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা দ্বেষ।
কালো বলে বাঙালীদের,
ভাল দেখতে পারেনাকো॥
যেখানেতে বাঘের ভয়,
সেই থানেতেই সন্ধ্যা হয়,
নীলকরের করেতে হোলো,
মাজিষ্টরি ভার।

এর্ বাড়া মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর।
খোদাইনে তোর্ উঠান চসি,
বাস্তুবৃক্ষ রাখেনাকো॥
কতক নীলের কর্ম্মকার,
কাজে যেন চর্ম্মকার,
নাহি ধারে ধর্ম্মধার,
মর্ম্ম বোঝা ভার।
ঠিক ধর্ম্মহীন ধর্ম্মতলার, ধর্ম্ম-অবতার।
কটু কথার কল্পতরু, বামুন গরু, বাছেনাকো॥
চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাচা ঢিলে,
চীলের মুখে মাচ।
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন্, কাচেন্ কাপের কাচ।
সাপের কাছে কেঁচো যেন,
সাত চড়ে ‘রা’ ফোটেনাকো॥
তুমি সর্ব্বশুভকরী,
বিলাত—ভারতেশ্বরী,
বিপদে শ্রীপদে ধরি,
কর করুণা।
রয়না দিন প্রজার তোমার, সয়না যাতনা।
কৃপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো॥

কি পাপেতে এমন্ হোলো,

অকালে আকালে মোলো

বৃষ্টি বিনে, সৃষ্টি পুড়ে,

গেল ছারেখার।

বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর!

এ দেশের দুর্দ্দশা এমন্,

হয়নিকো আর হবেনাকো॥

কুটিয়ালের মেজেষ্টরি,

লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,

এ আইন হয়েছে জারি,

মার্ত্তে আমাদের।

আইনকর্ত্তার পেটের বার্ত্তা, পেয়েছি মা টের,

যাতে অবিচারে প্রজা মরে,

এমন্ আইন রেখোনাকো॥

—*—

চতুর্থ গীত।

মহড়া।

চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
কত আর চল্‌বো নূতন চেলে ?
যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥

অন্তরা।

ওমা বিক্টোরিয়া, "আসিয়া" আসিয়া,
দেখ মা ! বসিয়া, নয়ন মেলে।
বল কে করে পালন, কে করে শাসন,
একেবারে সব্, মোরে গেলে ॥
দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল্, ফুরাইলে চাল্,
কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে ?
যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল,
সিদ্ধ পক্ক কোরে, আড়ে গেলে।

আম্‌রা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,
বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে ॥
শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর্ বেড়েছে চার্ গুণ, বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে ॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥
শুনে জিনিষের দর, গায়ে আসে জ্বর,
ছুটে যাই ঘর বাড়ী ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই,
কাটের মুরুদ বনি হাটে গেলে ॥
ঘরে না থাকিলে কাঁট, করি কাট কাট,
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে।
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে,
হোতো না যাতনা, একলা হোলে।
দেখে দুখের বাড়াবাড়ী, ফিরি বাড়ী বাড়ী,
মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥

দরে হোলো গঙ্গাজল, জ্বলন্ত অনল,
দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে।
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পে
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে॥
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হোলো হুজুর,
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে।
যত ঘাটের দাঁড়ী মাজি, কামে নহে রাজি,
কাজির মেজাজ ধরে, ধ্বজী ঠেলে।
থেকে নদী নদে, ঝিল বিল হ্রদে,
মাচ ধরে খায়, মালা, জেলে।
তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর,
ছুনো দরে বেচে চুণো বেলে॥
হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে॥
শুনে চেলের বুকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা,
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে।
ওমা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি!
পালাইনেকো কেউ রাজ্য ফেলে।
হোলো গোড়ার সর্ব্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস,
কেমনেতে বাঁচে, ঢোঁড়া ছেলে?
যত নীলের কর্ম্মকার, করে অত্যাচার,
মেজেষ্টরি-ভার, তারাই পেলে।

বাঘের গোবধে কি ভয় ? প্রজা নাহি রয়,
তারা খেলে খেলে সব, ধোরে খেলে ॥
শুন ওগো কৃপাময়ি, মনের দুখ কই,
ওমা, আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ?
জপি দিবস রজনী, জননী জননী,
ঠেলো না চরণে, কেলে বোলে ॥
মাগো, করি সুবিচার, সুত সবাকার,
ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বোলে।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥

পঞ্চম গীত।

(রামপ্রসাদী সুর।)

সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা !
ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আস্‌বিনি কি তাদের ফেলে ?
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
দেখ্‌তে হয় মা নয়ন মেলে।

অন্তরা।

থাকো থাকো থাকো তুমি,
রাঙা ছেলে কোরে কোলে।
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,
কালামুখো কাঙাল বোলে?
কালো ছেলে যত আছে,
"কেলেসোণা" তোমার কাছে, মা গো!
এই কালোর ভিতর আলো আছে,
ভালো কোরে দেখ জ্বেলে॥
দেহ কালো, কালো নই,
ভিতরেতে কালো কই?—মাগো!
যারা কালোমনের মানুষ, তারা,
হিংসে কোরে কালো বলে।
কুপুত্র যদ্যপি হই,
তোমা ছাড়া কারো নই, মা গো!
তবু দয়া করি দয়ামই,
রাখতে হবে চরণতলে।
কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো!
তুমি জগতের মা, আমাদের মা,
ডাকবো জগদম্বা বোলে।

"ইণ্ডিয়া" কোরেছ খাস,
পূরাও গো মা অভিলাষ, মা গো!
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,
রক্ষা কর ভাতে জলে।
অন্নপূর্ণা নাম ধর,
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
যেন আকালেতে অকালে মা!
কাল্-কুটিরে যাইনে চলে।
যাতনা সহেনা আর,
ঘুচাও প্রজার্ হাহাকার, মা গো,
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা!
কলঙ্ক-সাগরের জলে।
ভারতের কর্ত্তা ব্যাস,
ভারত ছাড়া নাহি চলে,
তোমার এই ভারতের এমন্ দশা,
ভারতে না খুঁজে মেলে।
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে,
বাঙালীকে কাট্‌তে বলে!
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালী ছেলে,
এরা ধর্ম্ম-পথে সদাই রত,

অধর্ম্ম করে না মোলে।
বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা মা গো!
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্মরণ,
ভাস্‌তে থাকি নয়নজলে।
বলে যত গো-বানর,
গবর্ণরে গবানর, মা গো!
ওমা "কেনিং" কভু "কনিং" নন্‌,
বলী তিনি ধর্ম্মবলে।
"হ্যালিডে" আর, "বিডন" আদি,
ধর্ম্মবাদী সত্যবাদী, মা গো!
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে বোলে।
দয়াদানে বাঁচয়েছেন সব,
পাপের কথা পায়ে ঠেলে।
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,
কোথায় যেতেম রসাতলে।
এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
এঁদের গুণে চলছে কার্য্য, মা গো!
এখন এমন্‌ বিধি কর ধার্য্য,
রাজ্যে যেন স্বোণা ফলে।
সম্প্রতি এক বিষম বিধি,

পাশ হয়েছে ছলে কলে,
এক কল্সী দুধে ঘোলের ছিটে,
নীলকরে রাজত্ব পেলে!
মরে প্রজা, মরে চাষা,
বেজির গর্ত্তে সাপের বাসা, মা গো!
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
বাদ্ করে মা! কদিন চলে?
বলে যারা জবরদস্ত,
তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মা গো!
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে,
হেলিডের পদ নাহি টলে।
বাঙলা দেশের কর্ত্তা যিনি,
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গো!
তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা!
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে অংশধারী,
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো!
নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
চক্র কোরে বেড়ান্ ছলে।
যার মনে যা উদয় হয়,
সেই কথাটী সেই তো কয় মা গো!
আমি জানি তিনি ধর্ম্মময়,

ধর্ম্ম আছে করতলে।
দাঁতে কুটো কোরে মা গো!
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে।
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা,
দৃষ্টি রাখো সুমঙ্গলে!
মা! তোমার শুভ হোক,
শত্রু সব ক্ষয় হোক, মা গো!
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,
বংশ না রয় ধরাতলে।
ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য্য করে কুতূহলে॥

দুর্ভিক্ষ।

প্রথম গীত।

বাউলচাঁদী সুর।

রাগিণী দেশমোল্লার—তাল আড়খেমটা

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেঁড়া, শিক্ষে ধোরে,
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন্ আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

যদি অনাথ বামুন হাতপেতে চায়,
ঘুসি ধোরে ওঠেন তবে!
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে হেড়্ল, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, ড্যাম বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হোয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে?
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হোলো কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে?
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ভবের টবে।
আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।

একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন " এ, বি, " শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥
এখন্ আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ওভাই! তারা মোলেই দফা রফা,
এক্‌কালে সব ফুর্‌য়ে যাবে।
যখন আস্‌বে শমন, কোরবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?
বুঝি " হুট " বোলে, " বুট " পায়ে দিয়ে,
" চুরুট " ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি,
কেমন কোরে ধর্ম্মে সবে ?
ওভাই! তত দিন তো খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুকুনো খাবে ?
মরি মেগে মেগে, * *
মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই!
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ?
হোলো নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
আমিষের মুখ দেখ্‌বো কবে ?
ওরে " উড়ো খই গোবিন্দায় নম "
এই ব্যবস্থা ধরি সবে।

এস " অক্ষয় দত্তে " গুরু কেড়ে,
" বাহ্য বস্তু " পড়ি তবে।
যত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে,
খাটে কোরে ঘাটে লবে।
দেশের কর্ত্তা যত কালা হলেন,
কাণ পাতেন না কান্না রবে।
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে॥

দ্বিতীয় গীত।

বাউলের সুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর্ গো মানা,
কর্ গো মানা।
যত তোর্ রাঙা ছেলে, আর যেন মা!
চোক রাঙেনা, চোক রাঙে না॥
প্রজা লোকের জাতি ধর্ম্মে,
কেহ যেন জোর করে না।

যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা।
ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধন,
ধর্ম্মমতে আরাধনা।
মহা অমূল্য ধন,ধর্ম্মরতন,
এমন্ ধন্তো আর পাবো না।
যত মিশনরি এ দেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা!
ফেরে হাটে. ঘাটে, বাটে, মাঠে,
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা।
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখ্রীষ্ট কর ভজনা!
ওমা হেদো বনে কেঁদো চরে,
তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না।
তার পাশে "হুমো" হুতুমথুমো,
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না;
যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী,
"ছেলেধরা" প্রতি জনা।
এরা জননীর কোল শূন্য কোরে,
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা।

সদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে মরে,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেউ বোঝে না।
হোরে পরের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হবে,
এইটী মনে বিবেচনা।
যেন আপন ধর্ম্ম আপ্‌নি পালে,
পরের ধর্ম্ম নাশ করে না।
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা,
রেখোনা মা, আর রেখোনা।
কেমন কুহক জানে এরা,
উপদেশে করে কাণা।
ওমা বংশ পিণ্ড ধ্বংস কোরে,
কত ছেলে খেলে খানা।
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা,
কেমন কোরে কোর্ব্বে মানা ?
ওমা, আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি,
খোট্টা লোকে তা বোঝে না।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী যদি তাদের,
চোক রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপি খুলে, আড্ডা তুলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।
নগর কমিশনর যাঁরা,
তাঁদের একি বিবেচনা।

একি প্রাণে সহে ঘাঁড় দিয়ে মা,
ময়লাফেলার গাড়ী টানা!
ওমা দুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে,
হিঁদুলোকের প্রাণ বাঁচে না।
যত শাদা লোকের অত্যাচারে,
গরু বাছুর আর বাঁচে না।
যত দেশের গরু ভুট কোরেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে খানা।
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটে,
আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইকো,
সুগ্রীব তার হল সেনা।
যত দিশি ছেলে কোপ্‌চে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা।
কারে কব দুঃখের কথা,
কাণ পেতে মা কেউ শোনে না।
যারে দেবতা বলে পূজা করি,
তাতেই হোলো বিড়ম্বনা।
যারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে,
করে কত হিত সাধনা।
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।

"গরু তরু" কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না।
ফলে "গরুগাছে" দধি, দুগ্ধ,
সর, নবনী, ঘৃত, ছানা।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে হানা।
ওমা, গোহত্যাটী উঠ্‌য়ে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা।
মাগো সকল গরু ফুর্‌য়ে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥
খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥
সোণার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা॥
এরা, না "হিন্দু," না "মোছোলমান,"
ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।

নয় "মগ", "ফিরিঙ্গী", বিষম "ধিঙ্গী",
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হোয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোণা জল, ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের "কুলতরী",
অকূলেতে কুল পেলে না।
কুলের তরী থাকলে কুলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না॥
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ ডাগর,
কালা পাণি বড় লোণা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিলো,
তখনি গিয়েছে জানা॥
এর দফ্‌রা খেয়ে নফ্‌রা যত,
কোরে বসে কি এক্‌ খানা।
তখন কর্ত্তারা কেউ শুনলেন্‌ না তো,
লক্ষ লক্ষ ছুঁচুর মানা॥
এরা বাঘেরে করিলেন শিকার,
কাঁদে করি ইদুঁর ছানা॥

তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কুরটনা।
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা,
অবোধে প্রবোধ মানে না॥
"কালবিল" * কাল্ বিল্ কোরেছেন,
হিঁদুর তাতে ঘোর যাতনা।
তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা॥
ওমা, যে পাপে হোক্ প্রজা মরে,
চার্ টাকা দর, চাল্ মেলে না।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচেনা॥
ওমা, যত বাবু, হোলো কাবু,
আর চলে না বাবুয়ানা।
যারা আঙ্গুর পেঁস্তা দিত ফেলে,
তারা এখন চিবোয় চানা!
বড়মানষী দূরে থাকুক,
ভালো কোরে পেট চলে না।
এখন্ কেমন্ কোরে চড়বে গাড়ী,
জোটেনাকো ঘোড়ার দানা!

---

* Sir J. W. Colville.

শাসন পালন করেন যাঁরা,
হোলেন তাঁরা কালা কাণা।
ওমা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,
নাইকো সেটী দেখা শোনা।
কত বার মা পোড়েছিলো,
দরখাস্ত কত খানা।
বলেন "ফিরি টেড়েড" বন্ধ কোর্ত্তে,
কোনো কালে কেউ পারে না॥
চেলের বাজার শস্তা কর,
পূরাও গো মা সব বাসনা।
তবে দুঃখী লোকের আশীর্ব্বাদে,
আপদ বিপদ আর রবে না॥
শিব সন্তেন কোর্চ্ছি তোমার,
মহামন্ত্র আরাধনা।
আছে মহারথী সেনাপতি,
ভগবতীর উপাসনা॥
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
রেখেছি মা "সেলেখানা"।
তাতে গুলি গোলা, সকল তোলা,
ভক্তি অস্ত্র আছে শাণা॥
আছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে,
সংখ্যা হয় না কত সেনা।

আছে জোড়া ঘোড়া সত্য, ধর্ম্ম,
উড়ে যাবে ধরে ডেনা॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেবো না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে,
আমরা ধোরে দেব "নানা॥"

আচার ভ্রংশ।

কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বোসে, মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত!
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফ্যালে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে!

বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে ?
যায় যায় হিঁদুয়ানী, আর নাহি থাকে॥
ওহে কাল কালরূপ, করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে ?
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও, আঁচমন কর॥

—*—

বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র।

রঙ্গবিলাস ছন্দ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস্ শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব॥

---

* Marshman যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে যান, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবিতা লিখিয়া, তাঁহাকে বিদায় দেন। দুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না।

শুভ্রদেহ ভূতনাথ, ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর॥
কথনো প্রখর বেগ, কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার অলঙ্কার, ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদী, ত্রিশূল ধারণ॥
ধূম্রপান ছল তব, কাগজের কল।
ঊর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্, জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী, নাহি খাও দম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

টাউন্সেণ্ড †, রবার্টসন ‡, নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এ টোকাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা, বগল বাজায়॥
"ডেবিল" দুপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া।
"এবিল" হতেছে সুখে, তোমায় স্মরিয়া॥
কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

লাঞ্ছনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি।
এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শূলী॥
তিরস্কার পুরস্কার, অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব।

---

† Meredith Townsend যিনি পরে লণ্ডনে Spectator পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে ইনি "সমাচার দর্পনের" সম্পাদক ছিলেন।

‡ তখনকার Government Translator.

কালীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহরে।
স্বষ্টির মড়ার কাঁথা, জমা আছে ঘরে ॥
ত্রিভুবন জয় করে, তব পরক্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্ ।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তব, যত গবানর ॥
সিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে।
হরে হরে বাবাজান, বাবাজান হরে ॥
ষোড়শোপচারে পূজা, ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়া স্থখে, খাও রাজভোগ ॥
তোমার গুণের কেহ, নাহি পায় ফম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

"ধর্ম্মতলা" ধর্ম্মহীন, গোহত্যার ধাম।
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর।
"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের, খেয়েছ তুমি আর (R)॥
কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর।
রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

কালো তুমি শাদা কর, শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর, অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা, পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো, ঝুঁটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালির দুখদাতা, বাঙ্গালীর যম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শুনিতেছি বাবাজান, এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন॥
যোড়করে পশুপতি, করি নিবেদন।
সেখানে কোরোনা গিয়া, প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম্ টম্ টম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

তৃতীয় খণ্ড।

ঋতু বর্ণন।

গ্রীষ্ম।

আরতো বাঁচিনে প্রাণে, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি, গুমটের দাপ॥
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর, জলে দিব ঝাঁপ?
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ॥
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

কি করে করুণ অতি, রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে, অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে, মিত্র তারে কয়?
মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয়?
এই ছবি এই রবি, খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয়, এই ত নিশ্চয়।
পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা, পুত্রগুণ লয়॥
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে, অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন, কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার, হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয়, ঘরের বাহির?
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর নাই॥

তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে, মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিরে বল, স্থলবাসী নর?
পশু পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর॥
শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে॥
তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বধে, নীচে তার জায়া॥
হাবা হোয়ে ছুটি বাবা, দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

বাঘ হোল রাগহত, ভাগ নাই তার।
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মৃগি।
তার কাছে শুয়ে আছে, মৃগ আর মৃগী॥

হরি হরি বেষ ভাব, ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে, প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই, দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম।
কত বা মুচিব আর, শরীরে ঘাম?
টস টস করে রস, ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায়, পোচে যায় চাম॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বব বম ভোলা॥

* * *

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল॥
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে, রসময় জাম॥
শুখায়ে সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার, হইয়াছে রাঙ্গা॥
নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল, শাঁসে যায় মারা॥
কোষেতে ধরেছে দোষ, জল না পাইয়া।
কাঁটাল হইল জেঠা, এঁচড়ে পাকিয়া॥
জল বিনা মধুহীন, হোলো মধুফল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদের বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

হইলে মধ্যাহ্ন কাল, কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে॥
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই করে খাই, পাখার বাতাস॥
পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে, হুতাশনমাখা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে, জগতের প্রাণ॥

অনিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে, পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত, কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত, হা জল যো জল, বলে মুখে॥
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে॥
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয়।
খেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায়, চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু॥

পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি, কিছু ভাল নয়॥
সুধু মাত্র, বেছে খাই, অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর, কম্বলের * গাছ॥
কেবল অম্বল রস, সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া॥
তবু পোড়া দেহ মম, না হয় শীতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর॥
শাখীপরে আঁখি মুদে, আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয় মাছ॥

---

* ভেড়া ও মটনাদি।

ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে।
ফুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে, পুড়ে হই খাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোঁদা।
তায় তার বোদা লাগে, মুখ হয় জোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে, উপবাস সার॥

তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল, নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে, নাকে করে বাস ॥
উষা আর উষসিতে, তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥
গুণগুণ, গুণ ভুলি, আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয়, কলি দলিবারে ॥
হইল সুবাসহন্ত, কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

মাট আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি ॥
হোয়ে চাষা, আশাহারা, হায় হায় বলে ॥
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী, নয়নের জলে ॥
শস্যচোর গ্রীষ্মব্যাটা, দস্যু অতিশয়।
কৃষির কল্যাণ-কথা, কভু নাহি কয় ॥
কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হোয়ে, মারা গেল চারা ॥
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—০—

নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাটি, মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি, টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি, কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস * ভরা, আইসের † পরে॥
শুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল।

—:০:—

মণ্ডালোষা দধিচোষা, ঢোসা দল যত।
কোষাধরা গোঁসাভরা, তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভুলে॥

* ইচ্ছা।
† বরফ।

শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়।
থপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে।
কোষা ধরে ঢক্ ঢক্, জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—ঃ০ঃ—

একেবারে মারা যায়, যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত, প্যাঁজখেগো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি, কোল্লা, মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা, তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে সুধু, বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

———০———

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম একি কর্ম্ম, হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন, ঘন দল, চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ, হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার, করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন॥

মেঘনাদে হয়ে বাক্, ধরা টল টল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

কোথায় করুণাময়, জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি॥
করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার।
পড়ুক আকাশ হোতে, সুধার সুধার॥
চেয়ে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল।
কিরূপ হোয়েছে সব, অচল সচল॥
আর নাহি সহ্য হয়, প্রভাকর-কর।
মারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি, আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল, হয় হয় হয়না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, সৃষ্টি আর রয়না॥
যাই যাই বিনা কেহ, কোনো কথা কয়না।
উহু উহু বাপ বাপ, তাপ আর সয়না॥
বরুণ করুণ হোয়ে, কৃপাভার বয়না।
জলধর চাতকের, তত্ত্ব আর লয়না॥
সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হোলো তপস্বিনী, যত সব ময়না॥

মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
মিছে ডাক্, শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলেনা দৃষ্টির গতি হায়॥
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরষা বরষা মারে বুকে॥

বরষার একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥
মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর,
শুখাইল যত জলাশয়।
হায় একি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥
ধ্যান করি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে,
হাজল যোজল শুধু কয়।
হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥
ফুটীফাটা হোলো ঘাট, চেলাকাট যেন মাঠ,
হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥
বরষায় খেলে হুলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার ?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।

বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনোরূপে রক্ষা আর নাই ॥
এতাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকীর মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় একি দায়।
দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,
জ্বর জ্বর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন ॥
ভূমে শস্য, ফল গাচে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা যথা শাখী যত, শুখাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হোলো সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোয়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে,
সমুচয় চারা গেল মারা ॥
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফুলবাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বোলে যায় নাসা ॥

কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষসহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিল এতদিন।
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হতেছে মলিন॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন।
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,
কোরেছিল প্রেম আলাপন॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন,
দ্রুতগতি উর্দ্ধমুখে ধায়॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা,
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে,
কালের কি ভাব চমৎকার॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যেন,
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আর,
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে।
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
হোয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।

নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাঁচিতে পারে,
কোথা তবে সুখের ভরসা ?
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ,
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার ॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা,
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত,
সকলেরি উদর ডাগর ॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত,
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল টম্বল ঢালি জল ॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম,
ঘামফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ, কণ্ডূ সব গায় মাটুরে মাজির প্রায়,
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥
শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুনি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায় ॥

পূজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
স্যাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাসি,
পান্তা খান আমানী রাখিয়া॥
কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
দেহ হোতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হোয়ে ভীম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাক্কাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল।
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, অকালে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ার গীত গেয়ে,
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত ॥
উড়ে বলে হোয়ে ভাই, সেটী গেলা কাঁই পাঁই,
* * গেঁহাড়ি-পো শলা।
লুগাপট্টা নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেরে,
থরারে মো ইসা উড়ি গলা ॥
দিশি পাত্তিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাহুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাত্তি তবু নিদ নাহিঁ হয় ॥
এঁদে দেয় ফুফু, নানী, কলুই ডেলের পাণি,
কঁ্যাচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥
আসমানে পাণি নাই, পোঁজিতে কি ন্যাথে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে,
মোট বই স্নাপ বিচাইয়া ॥
আনি দে * * * বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
চাহা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
বগবতী বৈরব কোহানে?

হিব হিব, অরি অরি. হুজ্জির হুত্তাপে মরি,
গরে যামু কেম্বাই করিয়া ?
বীমাবর্ত্তা বগমান, আমগান রাখ জান,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া ॥
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায় ।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায় ॥
হাফকাষ্ঠ কালা ট্যাঁস, কলমে না চলে ফ্যাঁস,
আফিসে খপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোরা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আস্থস না কেউ মোর কাছে ॥
নেটিব কেরুর সাৎ, বোলতে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।
গমিস ডিকোষ্টা সাৎ, দৌড়িয়ে কেটেন্থ রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥
সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়,
ও গড ও গড, ড্যাম হাট।
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল,
তবু সদা গলা হয় কাট ॥
দ্বারে মোড়া খস খস, জল দেয় ফস ফস,
সে জল অনল বোধ হয়।

নিরন্তর খায় সোদা, জোঁদা মুখে লাগে বোদা,
বিবিদের বিদরে হৃদয়॥
কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার,
যত যত ব্যবসায়ীগণ।
এক দশা সবাকার, শরীর বহেনা আর,
নিজ নিজ কর্ম্মে নাহি মন।
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট,
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়।
পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,
পোড়ে থাকে যথায় তথায়॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,
জপে তপে মন নহে স্থির॥
যাহা হোতে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার॥
কাননের পশুগণ, এতদূর জ্বালাতন,
সমভাবে শান্তিগুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে॥

কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জর জর হোয়ে পোড়ে আছে।
গ্যাঁওর গ্যাঁওর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে॥
ঢুকে গৃহস্থের পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবস তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত, হোয়ে বলবুদ্ধিহত,
সমরে সাজেনা আর কেহ॥
শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব,
আহার বিহার নাহি করে।
নীড় মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে॥
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা,
বোসে আছে কাছে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শতধারা জল॥
মিছেমিছি জেঁকে ঝুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশা,
আরো তিনি হন জ্বালাতন॥
দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।

এমন আঁকশী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই,
আকাশেতে জল আছে কি না।
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হয় রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি
কৃপাদৃষ্টি কর একবার॥
বরষায় নাহি বারি, দৈব বিড়ম্বনা ভারি
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি
কেন কর আপনি সংহার?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিতল
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে থেয়ে ফোঁস ফোঁস
শব্দ করে সাপের সমান॥
দিনমান নিশামান, দূরে থাক পরিমাণ,
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি
বৃষ্টি হোক মূষলের ধার॥
চতুর্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হোয়ে যেন রয়
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপা কর কৃপাকর
প্রণিপাত চরণে তোমার॥

আর এক ভিক্ষা চাই. দয়া কোরে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তিজলে করহ সংহার॥
এই শান্তি জল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ অনল করি নাশ।
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক,
এই মাত্র মনে অভিলাষ॥

বর্ষার বিক্রম বিস্তার।

ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত॥
নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবারে।
করিলেন বারি বৃষ্টি, মূষলের ধারে॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহা সিন্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয়॥

গৃহস্থের কান্নাহাটী, রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ী, জলে যায় ভেসে॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলে॥
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়া ভ্যালা।
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খ্যালা॥
পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে।
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা।
গেল ধ্বন্ধ, মহানন্দ, চাষ করে চাষা॥
রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ।
সুখে কহে কর সার, বরষার পদ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে, প্রেমানন্দ ঘোরে।
হায় রে বরষা ঋতু, বলিহারি তোরে॥

বর্ষার ধূমধাম।

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে॥
সুমধুর কত সুর, ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায়॥
কড়্ কড়্ মড়্ মড়, রাগে রাগ বাড়ে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে॥
ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্, নহবৎ বাজে॥
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে॥
হুড় হুড় দুড় দুড়, ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে॥

ভন্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধ্বনি।
কত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি॥
শশধর জর জর, জলধর-রবে।
তারা যারা পতিহারা, কাঁদে তারা সবে॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দুখে॥
বরষার অধিকার, হইল গগনে।
হাস্যমুখ মহা সুখ, সংযোগীর মনে॥
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে॥

সুবৃষ্টি।

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ।
স্নিগ্ধ কর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন-প্রফুল্লকর অতি।

হায় রে কাদীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা,
সাথে মজে ব্রজের যুবতী ॥
শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।
দুখের যামিনী ভোর, সুখভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয়গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।
করি রব কুক্ কুক্, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ,
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর।
আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা।
হইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
স্নান করি ধারা-জলে, শ্যামল বিমলদলে,
তরুতলে নব শোভা ধরে।
বিরহ বিশ্রামে যেন, হাস্যরসপূর্ণ হেন,
যুবাজন-আস্য শশধরে ॥

তরুণ পল্লবমালে, দেখা যায় ডালে ডালে,
কদম্ব-কলিকা বিকম্বিত।
মধুমক্ষি মত্ত হয়ে, সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,
পান করে অমৃত অমিত॥
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা রচনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তভার, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি,
মত্ত হয় বরষা-কৃপায়।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায়॥
আর এই দেখ সদ্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা যোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক-মনোহরা॥
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা গুণে বলিহারি।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদ,
হইয়াছে শেখরবিহারী॥
রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরম পদ,
সাগরেতে করিছে পয়ান।

তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে পান ॥
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা ॥
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ॥

বর্ষার আবির্ভাব।

ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
বরিষে জলদ জল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ॥

তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।

* * * *
* *

নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন.
আজ প্রভাতের দিনকর॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।

সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাজে মাজে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥
চক্‌মক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা ॥
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া ॥

—*—

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্, গুড়ুম গুড়ুম গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়ঢাক ॥
ওই করে ফর্ ফর্, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥

যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত॥
পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক॥

——*——

বর্ষায় লোকের অবস্থা।

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী,
মোনমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥

ধনির স্থখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার॥
দীন তাহা কোথা পান, স্থধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।

বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজনে করি আশীর্ব্বাদ ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যাঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যাঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতিধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥

বর্ষার ঝড়বৃষ্টি।

মালঝাঁপ ছন্দ।

ঘটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে।
শুনি চিত, চমকিত, বিচলিত, সবে॥
ঝন্ ঝন্, ফণ্ ফণ, সন্ সন্, ঝড়ে।
তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে॥
বিজলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে।
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালসাট, চোটে॥
বহে বাত, ছাঁত ছাঁত, শিলাপাত, সঙ্গে।
বোধ হয়, করে লয়, সমুদয়, বঙ্গে॥
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে।
নদী নদ, পেয়ে পদ, গদ গদ, অঙ্গে॥
হেউ হেউ, করে ঢেউ, যেন ফেউ, ডাকে।
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে॥
তদুপরি, যত তরী, নৃত্য করি, যায়।
প্রেমিকের, হৃদয়ের, আশয়ের, প্রায়॥
রাজহাঁস, কি উল্লাস, অভিলাষ, পূরে।
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘুরে॥

কি আহ্লাদ, করে নাদ, অতিখাদ, সুরে।
অবিষাদ, যত বাদ, বিসম্বাদ, দূরে॥
দামোদর, খরতর, কলেবর, ধরে।
একি লগ্ন, বাঁধ ভগ্ন, দেশ মগ্ন, করে॥
গেল ধান, নাহি ত্রাণ, কিসে প্রাণ, বাঁচে।
ঘোর রিষ্টি, অতি বৃষ্টি, যায় সৃষ্টি, পাছে॥
লক্ষ লক্ষ, পশু পক্ষ, বিনে ভক্ষ্য, মরে।
প্রজাদল, হতবল, চক্ষে জল, ঝরে॥
যত চাষা, হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে।
কপালের, ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে॥

শরদ্বর্ণন।

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন,
শুনিয়া শরদ-আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ,
হাহাকার করে ঊর্দ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
কাননে লুকায় মনোদুখে॥

ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যাঙ্গ লয়ে ব্যাঙ্গ ভায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব ॥
গগনের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি ॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায় ॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতিহারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে ॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কল কল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন ॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।

বহু দিবসের পর, মত্ত হোয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
রসে শতদল দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুন্ গুন্ মুখে॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে॥
ছয় ঋতু মধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্র যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনী মণ্ডলে॥
মৃণ্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া,
তরে লোক ইহ-পরকাল।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব,
পঞ্চানন তবু মহাকাল॥
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু,
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্ ঋতু।
দুর্গা দরশন অর্থে, শরদে আসেন মর্ত্যে,
সুরগণ সহ শতক্রতু॥

লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক্ করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস॥
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্ণনা করিব তাহা কত।
যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন,
আয়োজন করে সেই মত॥
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে,
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
যত্নে তুলি হস্তে তুলি ধরে॥
ঢাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক,
ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
করে আচ্ছা সাঁচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ,
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক॥
দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোভা।
ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
ধরাতে ধরে না যার শোভা॥
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি,
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।

মনে আছে প্রেম আটা, মাখিয়া বেলের আটা,
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥
সবে বলে সাজা সাজা, জানেনা শেষের মজা,
সঙ সেজে কত রঙ করে।
কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ,
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে ?
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই,
তুমি কর কার চক্ষুদান ?
আপনি না হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্ম্মাণ ?
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
হর হর বল জীবচয়।
গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥
কামনা কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে,
গল্পফেঁদে কল্প করা দোষ।
ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ মহারত্নে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥
যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।
যজমান বড় আঁট, পক্ষবৃত্তি চণ্ডীপাঠ,
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা ॥

নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প,
গাল গল্প প্রতি ঘরে ঘরে।
কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা,
ঘর দ্বার পরিষ্কার করে॥
প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা,
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন।
তুমি কর যত রূপ, কতরূপ তার রূপ,
অপরূপ বিরূপ রচন॥
মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার,
রঙিন্ করিছ ঠাঁই ঠাঁই।
কিন্তু তব বাস ঘর, নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামত নাই॥
যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর,
অনায়াসে ব্যয় করে ধন।
দান কার্য্যে সদা রত, এখন সম্পদহত,
দুর্গা তার দুর্গের কারণ॥
পোড়ে ঘোরতর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল।
নাহি আর ধূমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাম,
কেবল নয়নে ঝরে জল॥
বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন,
স্নান পূজা কিছু নাই আর।

হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি,
অনাহারে ফেরে দ্বারে দ্বার ॥
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক,
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দান।
বাবুজী কল্যাণ হোক্, সন্তান সুখেতে রোক,
দাতা নাই তোমার সমান ॥
ধনে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে,
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি।
পূজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন,
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী ॥
পুত্র দুটী শিশু অতি, কন্যাটীও গর্ভবতী,
বাটীতে মায়ের আগমন।
ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক রক্ষা করে,
আমি গেলে হবে আয়োজন ॥
যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা,
কিছু মাত্র দেন নাই কেহ।
ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে,
ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ ॥
ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হোয়েছেন বড় কাবু,
রায়েদের সুপ্রতুল নাই।
হাঁচ্ হাঁচ্ যে, তা তবে, বল কি উপায় হবে,
শুধুহাতে কেমনেতে যাই ?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র যজ্ঞসূত্র,
মোটা ফোঁটা কথা রুকে রুকে।
ছলেতে হবেন মান্য, "হরিদ্রা গোরস ধান্য",
ইত্যাদি কবিতা পাঠ মুখে॥
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা, বড় বড় কথা লম্বা,
হতভোম্বা ভঙ্গী পরিপাটী।
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্‌নাই,
সেকি কি কথন হয় খাটী?
প্রতিবারে করি দান, না দিলে থাকে না মান,
দেনা করি খত দেন লিখে।
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতি বাক্যে বাবুজীর,
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে॥
নাকে খত কাণে খত, দুনো সুদে লিখে খত,
আপাতত দূর করে দুখ।
সুখের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে ঋণজালে,
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥
যত ব্যাটা ভবঘূরে, নূতন নূতন সুরে,
নূতন নূতন শিখে গান।
সাধিতে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল,
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান॥
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লোয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
যথা যথা আকড়া যাহার।

পূর্ব্বে প্রায় মাসাবধি, না খায় অম্বল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার ॥
কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত,
ভাব তার না হয় প্রচার।
চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ স্বরে গলা সেধে,
গান ধরে "ভবে কর পার" ॥
যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে ঢলাঢল,
সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে।
কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাঁজায় দম,
তান ছাড়ে "দেওরার গানে" ॥
যাত্রাকরে করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা,
প্রথমে মহালা করে দান।
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দূতি,
"কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ ॥"
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে,
পণ করি দেয় তার পণ।
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা,
গুণে তার খুন করে মন ॥
যাত্রার গমক ভারি, নামজাদা অধিকারী,
আসর করিছে অধিকার।
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে দেয় পেলা,
সাবাস্ সাবাস্ বার বার ॥

আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,
হেলা কেন করিতেছ কাজে ?
ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে ?
এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী,
তাঁর প্রতি কেন কর হেলা ?
মান রেখে তান্ ধর, ফুরালে মানের ঘর,
কবে আর পাবে বল পেলা ?
দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি,
হবে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে।
কর যাত্রা, দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে॥
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুখের লক্ষ্য,
রজনীতে গানবাদ্যছটা।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক,
কি কহিব আমোদের ঘটা॥
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,
মনোগত রাগ সুর ধোরে।
মৃদু তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান,
বাবুদের লবেজান কোরে॥
গুনি-হস্তে তানপূরা, তাহে কত তান্ পূরা,
মেও মেও ছাড়ে তার তার।

কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ,
রাগ নয় রাগমাত্র সার ॥
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,
সেতার বেতার কার লাগে?
পিড়িং পিড়িং রারা রারা, সারিগামা ডারা ডারা,
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥
তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,
বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
মনে জ্বলে আনন্দের আলো ॥
সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢলির ঢোলে কাটি।
তাধিন তাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী ॥
নবতের বড় ধূম, গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই ॥
এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কাঁদে তিনরোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুসার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুঃখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্য চ্ছলে মিসি লন কিনে।
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসেরের পরে, প্রবাসিরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কামকিরাতের সাতনলা।
প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কানবালা॥
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনক-দুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই।

কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বাগড়ি ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাঁচুলি করে,
চুমকির কাজ তার মাঝে।

* * * * * *

হেরি শশী শশধরে লাজে ॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কচ্ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর ॥
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখে মরে যাই ॥
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায়না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাপি মিসি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা ॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া।

নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত
হার হারে যাহারে হেরিয়া ॥
জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাতাঘষা,
কসা কিম্বা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে ॥
অন্তরেতে ভয় আছে, পছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি পূজার কারণ ॥
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,
দেশে গিয়া সাজিবেন বাবু ॥
কালাপেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিসি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন মেরজাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে ॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেই মত,
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে,
আর কিছু আতর গোলাপ ॥

সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত,
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সবে ঘোর গর্জ্জি, বাড়ীতে আনিয়া দর্জ্জি,
পোসাক করিছে কত মত॥
কারপেট ঢাকে সেট, কারপেট্ কারপেট্,
কারুকর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব,
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি,
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা,
ব্যয়কল্পে না হন কাতর॥
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ অনলে মন জ্বলে॥
হইবে পতির সুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কয় এই কথা।

চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখ ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে ॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি,
কুটি গিয়া ছট ফট করে।
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কত দূর আছে ?

কোসে দাঁড় টান দাঁড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরি ত্বরায় করিয়া।
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সিস পাবে,
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া॥
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজি,
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর।
গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,
খোসে গেল মনের কপাট।
বাড়াদূর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহিরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ।

নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরি,
না মানে শিশির আর ধূপ ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায় রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত ॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-পবন-ভরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁদি গিয়া সোই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥
হোলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই,
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওলো ছুঁড়ী,
ওযে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কহে দূর দূর, ওবাড়ীর বট্‌ঠাকুর,
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥

আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের চাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে॥
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই মোলো মোলো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বল,
ওযে দেখি দাদার মতন॥
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
মনে মনে কত শোক উঠে।
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ বৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজ পতি দেখিতে না পায়॥
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয় ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে॥
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।

তোমার শ্বাশুড়ী গিন্নি, মেনেছে পীরের সিন্নি,
সন্তানের আসিবার তরে॥
সুর তরঙ্গিণী জলে, * * দলে,
পরস্পরে বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলে পুলে, কর্ত্তাটী রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর॥
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,
ধার করে কত হব সারা।
কেহ বলে অতি গাদা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
এক মাস লেখে নাই চিটি॥
সেজোবৌর্ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোন মতে যেতে নাহি পারি।
বছরের শুভ দিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোনার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার॥

জুগি জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে থাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাড়াদুর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূর দেশে।
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো,
হাঁটাহাঁটি ফাটাফাটি শেষে ॥
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থবু তবু সাধ মনে।
ছোটে কত কষ্ট সোয়ে গৃহে গিয়া গৃহী হোয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।
কেহ গাড়ি কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধুলি,
চোলে যায় নিজ মনোরথে ॥
এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যারা যায় পায় হেঁটে,
নাহি কোঁচ্‌কা পিটে বোচকা ঝোলে।

ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে॥
স্নান পূজা কেবা করে, কোঁচড়ে জলপান ভরে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে॥
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।
কাঁকে ঝুলি রুকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ॥
অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্য কথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,
তাড়াতাড়ী বাড়ী যায় ছুটে॥
ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাকো দেশে॥
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে॥

সন১২৫৫ সালে

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন।

আইলেন ঋতুরায়, সবল শরদ।
পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ॥
বরদার প্রিয় ঋতু, নহেন বরদ।
প্রিয়পাত্র প্রভাকর, কেবল খরদ॥
তাঁর দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ।
কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ॥
না দেখি প্রজার প্রীতি, কিছুই দরদ।
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ॥
অতিশয় পেয়ে ভয়, লুকায় নীরদ।
অসহ্য সূর্য্যের তাপে, শুকায় ক্ষীরদ॥
গ্রীষ্মরোগে নিজে ঋতু, খাইল পারদ।
হইল কোন্দলকর্ত্তা, সাক্ষাৎ নারদ॥
স্বভাবের দোষ হয়, কখন কি রোধ?
দেবঋষি সম সুধু, বাধায় বিরোধ॥

আপনি স্বতন্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে।
নিদাঘ বরষা হিম, দ্বন্দ্ব এই তিনে॥
মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ করে রিষ।
কুলা প্রায় চক্র তায়, নাহিমাত্র বিষ॥
ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে, বিষম প্রবল।
রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল॥
স্বভাবের ভাবান্তর, ভাবভরা ভব।
শরদের চিহ্ন মাত্র, শুভ্রাকার নভ॥
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি, লোকে এই বলে।
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে॥
মধুভরে মনোলোভা, কিবা শোভা তার।
ভূষার সুসার করে, ঊষার তুষার॥
মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে॥
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ॥
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে॥
অনিবার হাহাকার, অর্থবলহত।
ঋণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চ্চনায় রত॥
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন॥

বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু॥
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে॥
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধহত।
কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্ব্বাসার মত॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট॥
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্ব্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুখে॥
যাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ॥
হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট।
"অপবিত্র পবিত্রবা" ঊর্দ্ধ এই পাঠ॥
পূজারির কার্য্য যত, সে কেবল রোগ।
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ॥
দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী, তুমি মা জননী॥
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান॥
এতদিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তারা।
এবছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা?

খাও খাও, পূজা খাও, করিনে বারণ।
এবার মা দুর্গে তুমি, দুর্গের কারণ ॥
তোমার পূজার জাঁক, বাজে ঘণ্টা শাঁক।
পরাভব করে তায়, রোদনের হাঁক ॥
ধরেছ মোহিনী মূর্ত্তি, দেবী দশভুজা।
দশহস্ত বিস্তারিয়া, সুখে খাও পূজা ॥
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট।
চালি কলা শসা মূলা, কত লও ভেট ॥
দধি খাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডা গজা।
মহিষ মরাল খাও, খাও মেষ অজা ॥
খাও কত ঘড়া গাড়ু, রজত পিতল।
তথাপি উদর-অগ্নি, না হয় শীতল ॥
তব ভক্ত অনুরক্ত, প্রজা সমুদয়।
অপমানে ক্রমে সব, ম্রিয়মাণ হয় ॥
হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজা রাধাকান্ত।
সুধার্ম্মিক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে।
প্রতিদিন পূজা দেয়, নানা উপচারে ॥
হায় খেদ মর্ম্মভেদ, খেদ কব কারে।
অবিচারে ম্লেচ্ছ রাজা, জেলে দিলে তারে!
হইলে আনন্দময়ী, নিরানন্দকরা।
রাজ-অপমানে হোলো, শোকে পূর্ণ ধরা ॥

কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে।
রোদনের ধ্বনি হল, বোধনের দিনে !!
রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ।
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ ॥
আশুতোষ আশুতোষ, সর্ব্বদোষহত।
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অবিরত রত ॥
গত বারে তুমি তাঁরে, হইয়া সদয়।
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয়।
দীন-দয়াময়ী দেবী, এই তব দয়া।
করিলে বিজয়া-দিনে, গিরিশ-বিজয়া !
দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন দ্বেষ ?
ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥
ছিলেন অনাথ-নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ।
যাঁর নাম স্মরণেতে, হয় সুপ্রভাত ॥
তুলিতে তুলনা যার, তুলো কোথা রয়।
হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয় ॥
সতত সরল মনে, যাঁর পরিবার।
করেন কেবল সুখে, পর উপকার ॥
এমন ঠাকুরপুরে, মনস্তাপ দিলে।
ভাসাইলে পৃথিবীরে, দুঃখের সলিলে ॥
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই, মানুষের মনে ॥

গড়েছে তোমারে বটে, খড় মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাঁক্তি, হাত থাঁক্তি, চাক্তি নাই ঘরে ॥
রূপা সোণা সব গেল, জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব, টাকা নাই দেশে !
দোকানী পসারী যত, আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই, জাঁক নাই হাটে ॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, স্বধু ঘর খোঁচে।
সন্তাদুরে ছাড়ে তবু, বস্তা যায় পোচে ॥

শারদীয় প্রভাত।

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর ॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।

নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নব ভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥
যেমন অন্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভুমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে তিনলোক ॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক দশা শেষ।
জীবনে দিবস কয়, এক অঙ্গে গত হয়,
যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার,
একবারে বিষয় বিচ্ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে হুলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে নির্ম্মূল ॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর ॥

ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,
সরমের সর্ব্বরী পোহায়।
লোকভয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি ততো ধায়॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান হয় মনান্তর মেঘে॥
বায়ু যোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।
এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা সমীরণ॥

———

অস্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহরে।
হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে।
দিনপতি প্রিয়দূত, পিকবর গুণযুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার॥

অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা সুরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে॥
রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধাস্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন॥

ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তিহর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ-অনাদর॥
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝল মল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হার রূপে শোভে সুবিমল॥
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিষ্টরব ?

এইরূপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুল,
প্রস্ফুটিত কানন ভিতর।
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর॥
আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত॥
ধবল তরঙ্গ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান।
হংস হৈত অপহ্নব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান॥
চারি দিকে বনচয়, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ।
নিরখি সর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের রঙ্গে আবরণ॥
ইন্দু বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে রত,
অবিরত দুখের উদয়।
দেখি তার মলিনতা, রুদ্যমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয়॥
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে,
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।

ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,

ক্ষরিতেছে হিম অশ্রুধারা ॥

ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতূহলী,

* * *

গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর,

চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ ॥

গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,

গাও গাও উচিত তোমার।

যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,

কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার ॥

কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,

ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে।

অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,

রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥

এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,

প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।

হায় হায় একি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত,

হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥

সে দিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,

সুখময় শারদীয় পূজা।

ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,

নিয়মিত দেবী দশভুজা ॥

প্রতি দিন ঊষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥

শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ করে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কাল সাপ্ ॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় জড় শড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জর জর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান্।

বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুর্মুহু গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥
চিরজীবি ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে ॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত ॥

সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥
থাকিতে ছুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ কুজ, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ॥
সম্মুখেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
দ্বার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে॥
চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্য রব,
তাহে কি হিমের হয় যোগ?
আমা হেন ভাগ্যপোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।

চন্ টন্ হাত থাকি, ভরসা মুড়ির চাকি,
পান মাত্র খেজুরের রস॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে॥
উড়ানী চাদর যত, এখন আদরহত,
আগে যাহে অভিমান রোতো।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥
ইয়ারেরা গদ গদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান্।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান॥
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী,
দমবাজি কারসাজি কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত॥

বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ।

শরদ ছিলেন রাজা, এই পৃথিবিদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য, কার্ত্তিকের শেষে ॥
কাঁপুনী হিমানী দুই, মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥
প্রকাশ করিয়া নাম, হিম ঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে ॥
ফাটাফোটা সেনাপতি, বল ধরে কত।
আহা উহু, হিহি হুহু, সেনা শত শত ॥
বাজায় বিজয়-কাড়া, উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর ঝিরহির, নাশ করে আয়ু ॥
নিশির বিষম দুঃখ, পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাপে ॥
কুআশার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত, কুআশয় তাতে ॥

নলিনী মলিনী মানে, বন্ধুবলহত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত, গাঁদাফুল যত ॥
শশীসূর্য্য তেজোহীন, রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কাঁপে ॥
শাসন করিল খুব, চারিদিক রুকে।
কার সাধ্য বাপ বাপ, জল দেয় মুখে ?
জলের হয়েছে দাঁত, হাত দেওয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ, খড়ি উড়ে গায় ॥
দিন দিন দীন দিন, প্রাণ তার হরে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশা বৃদ্ধি করে ॥
দীনের দারুণ দায়, দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিশা তায়, নাহি কোন নিশে ॥
এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে, বিপরীত ঘটে ॥
শীত-ভয়ে কোপে ঝাল, নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, সুকো রূকো খেয়ে ॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি হয়, মুখে দেয় তুলে ॥
প্রচার হইল খুব, শীতের বিক্রম।
করিয়া আসন জারি, শাসন বিষম ॥
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ, সুখ কিসে হবে ?
বড় বড় বীর যত, জড়সড় সবে ॥

এইরূপে দুই মাস, লয়ে সেনাজাল ।
করিলেন রাজকার্য্য, শীত মহীপাল ॥
বসন্ত শুনিল সব, হিমের ব্যাভার ।
সুখের ধরণী রাজ্য, করে ছারখার ॥
প্রজা মধ্যে কোন মতে, সুখী নহে কেহ ।
শীত-ভয়ে থর থর, জর জর দেহ ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর, দুঃখ সমুদয় ।
মনেতে হইল তাঁর, ক্রোধ অতিশয় ॥
দেখিব কেমন সেই, দুষ্ট দুরাচার ।
এখনি হরিয়া লব, সব অধিকার ॥
মলয়া পর্ব্বতে বসে, গোঁপে দিয়া পাক ।
দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাঁক ॥
আইল দক্ষিণে বায়ু, শব্দ ফুর ফুর ।
অকালে ডাকিলে কেন, রাজা বাহাদুর ॥
রাজা কন সাজ সাজ, বীর সেনাপতি ।
অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্র গতি ॥
কোন প্রজা সুখী নহে, শীতের শাসনে ।
লইব তাহার রাজ্য, অভিলাষ মনে ॥
কামের কামান তায়, লোভ গোলা রেখে ।
গোটা দুই কোকিলেরে, শীঘ্র লও ডেকে ॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল ।
আইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥

সিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে, ঋতুপতি শীত।
রাণী সঙ্গে রসরঙ্গে, ছিল হরষিত॥
সবিশেষ নাহি জানে, কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ, সেরূপ প্রকার॥
হঠাৎ বসন্ত আসি, হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ॥
না রহিল কোন চিহ্ন, সব গেল উঠে।
উত্তরে বাতাস ভয়ে, পলাইল ছুটে॥
কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর।
বসন্ত প্রভাবে মার, করে মার মার॥
মলয়া পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ, বসিলেন জেঁকে॥
বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহু রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল
নাম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হল, বড় বড় সাল॥
সকলের মহানন্দ, বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী, ইয়ারের দলে॥
উড়ানি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাড়ি।
ছুড়ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী॥
শীত ঋতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে।
মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে

কি করিব, কোথা যাই, বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার, রাজ্য নিলে লুটে॥
ঘোর দায় সদুপায়, নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষ, যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা, আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা, আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই, প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন, সিংহাসনে গিয়া॥
বস বস স্থির হও, শান্ত কর মন।
দেখিব কেমন সেই, দাম্ভিক দুর্জ্জন॥
একেবারে বসন্তেরে, প্রাণে কোরে বধ।
তোমারে করিব দান, পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ।
তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ।
ধরণীমণ্ডলে তুমি, করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তেরে, করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া, নিজ সিংহাসন॥

জলদ জলদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে।
যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোয়ে॥
কামান কামান নয়, বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে॥
কাপ্তেন পূবের বায়ু, দিয়া খুব ফের।
চারি দিক ঘুরে করে, ফায়ের ফায়ের॥
বসন্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভুট।
প্রাণ ভয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট॥
বহিছে উত্তর পূবে, অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীত ভয়ে, উহু উহু করে॥
ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম, বসিলেন কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয়, বসন্তের দলে।
সা সুজা যেমন জয়ী, ইংরাজের বলে॥

বসন্ত বিরহ।

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে, কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি, বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায়, অভাগীর মন॥
পলাসে বিলাস করে, মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তার, মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান॥
সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে, আঁখি হোলো অনিমিখ॥

---*---

চতুর্থ খণ্ড।

যুদ্ধবিষয়ক।

শীক সংগ্রাম।

বিজ্ঞবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর।
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর॥
নরবর গবর্ণর, মনে এই ভয়।
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়॥
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধুম।
ঊর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধুম॥
শীকের এবার বুঝি, নাহিক নিস্তার।
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার॥
ব্রিটিসের জয় জন্য, অভিলাষ মনে।
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে॥
আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে রয়ে।
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে?
মহামতি সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া।
বিপক্ষের গুলি খেয়ে, মলো তাঁর ঘোড়া॥

বড় বড় বলবান, যোদ্ধা যোদ্ধা যত।
ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মত॥
লিখিতে উদয় দুঃখ, লেখনীর মুখে।
সেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে।
মরিল শীকের হস্তে, সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ, কিসে হবে দূর।
ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুক্কুর!
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক যাঁরা।
নিয়ত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধারা॥
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ॥
অবশ্য হইবে তার, হিংসা পরিশোধ॥
নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক।
ধর্ম্মরাজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক॥
অমর সমরকল্পে, ব্রিটিসের সেনা।
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা॥
লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোপ।
নির্ভয়েতে যোদ্ধা সব, কর ভাই হোপ॥
শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ।
উড়ে যাক্ শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক্ গোঁপ॥
বিপক্ষের পরাক্রম, সব করি লোপ।
শতদ্রুতে স্নান করি, গায়ে মাখ সোপ॥

কিরূপেতে পরিপূর্ণ, সমরের স্থল।
কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল॥
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উড়ি যাই তথা॥
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অনুরাগে।
গুলি যেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে॥

—*—

যুদ্ধের জয়।

সেফালিকা পদ্য।

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

—*—

কালগুণে বিপরীত, বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শীক সব করিয়া বিক্রম॥

বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী।
উর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি ॥
তুরঙ্গের খরগতি, খর করে শক।
বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছা করে বক ॥
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

পঞ্জাবীয় শীকদের, আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে ॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর ॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে, ঘোরতর রণ ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ।
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ॥
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ।

আমাদের সেনাদের, বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর, সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট, তাঁবু টেণ্ট ফেলে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে, অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে, দুর্গে বলে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত॥
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

রণভূমি ছেড়ে যায়, যত চাঁপদেড়ে।
গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কূলে।
বুদ্ধি-লোপ দাড়ি গোঁপ, সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড়্ মারে চড়্ সিফায়ের দলে।
ধড়ফড়্ করে ধড়, পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্ব্বার উঠিবার, শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

ভাগিয়াছে শত্রু সব, লাগিয়াছে ধূম।
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি হুকুম॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন, সেনাগণ সাজে।
মহাজাঁক ঘন হাঁক, জয়ঢাক বাজে॥
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল, টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে॥
ধন্য চিপ কমাণ্ডার, ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গড়ে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ, ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান, গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে, বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো, শত্রু সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটীসের জয়॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

ভারতের অবোধ, দুর্ব্বল লোক যত।
ডাল্ ভাত মাচ্ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয়, এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শীক সেনা, শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা, সমুচিত নয়॥
কেহ খড়্গ, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ হও॥

করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়াছে রণে॥
আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধোরে দিব টান, বাড়ী মেরে বুকে॥
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য, আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল, মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি॥
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ি বাঁধ, পর সাদা ধুতি॥
দোবজা দোছট করি, চোট্ কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে, যেওনাকো রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট্, মালসাট মুখে॥

মুদকির যুদ্ধ।

লেগেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, নাহিক নিস্তার॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া, যুদ্ধে হয়ে রত॥
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শীকে, হইয়া প্রবল॥
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদকির রণে।
হেরেছে সকল শত্রু, গোরাদের সনে॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভার লয়ে॥
হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার॥
লয়েছে দুঃখের ভার, শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত॥

ধরেছে ইংরাজ সেনা, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল বস্ত্র, অস্ত্রযুক্ত কর॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সবে, টলিছে ধরণী॥
ছলিছে ছলনা করি, বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে, জয়যুক্ত ফল॥

যুদ্ধ।

শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
মেশেছিল সেনা শত শত।
কটুভাষ ভেষেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
পেসেছিল অভিলাষ মত॥
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল॥
জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল,
জ্বেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি ঘেরেছিল, কোসে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে॥

বহুসৈন্য লোয়েছিল, গুলিগোলা বোয়েছিল,
হোয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।
যত কথা কোয়েছিল, আমাদের সোয়েছিল,
রোয়েছিল সম্মুখেতে আসি॥
কালবেশ ধোরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হোরেছিল,
কোরেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক জোরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
মরেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাঁপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল,
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলিগোলা আগে।
গোরা শেষ চেড়েছিল, ভুমিতলে পেড়েছিল,
তেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে।
গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পরাজয় মুখে॥
মার রব মুখে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।

রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর॥
কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শীকমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ি গোঁপ পুড়েছিল,
থুড়েছিল ধরি তরবাল॥
শত্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,
এঁটেছিল করিয়া শাসন॥

।

থ্যাঙ্ক লাড্ ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শীক-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হোতো আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি॥
যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ॥

তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে॥
ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষ্যণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয়॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শীক।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলি গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাঁপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বপার ছেড়ে॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
কোরে কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ি গোঁপ সব গেল পুড়ে॥
শীক শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।

সকল হইল ভুট, গোটুহেল ড্যাম্ হুট্,
ফেলে উট্ দিলে ছুট্ ভয়ে ॥
হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্।
কড়্ কড়্ চড়্ চড়্, ঘড়্ ঘড়্ ফড়্ ফড়্,
হড়্ হড় দড়্ দড়্ দুম্ ॥
গাড়া গাড়া গুম গুম্, ডাগা ডাগা ডুম্ ডুম্,
গুম্ গুম্ জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভেরি রাগ ভাঁজে ॥
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম্ ড্যাম্ গোরাগণ ডাকে।
* * কাঁহা বাগা, আবি তেরা শের্ লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে ॥
যুদ্ধের বিষম ধূম্, গগনে উঠিল ধূম্,
ঘুম নাই নয়ন নিকটে।
ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শক্রদল।
কোরে চোট দিয়ে জোট, ধর্‌চোট নিলে কোট,
শীক গোট গেল রসাতল ॥

জোরজার শোরসার, ঘোরঘার ফেরফার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে।
শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
বার বার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, • ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি॥
শক্রচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হলো ছারখার।
শতদ্রু সলিল অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ রঙ্গে,
বিভূষিত শীকশবহার॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর॥
মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।

নানক বাবার বরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হোক ইংরাজের সহ ॥
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাট্।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট ॥
কোরে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইস্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে ॥
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা।
এবিল ইংলিস যত, ডেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা ॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন,
সরমন্ পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্লাস,
কহিবেক হিপ্ হিপ্ হোরে ॥

চপলাবলী ছন্দ।

হে, পব, নর। মানব, বর।
রণ স, ম্বর। বচন, ধর॥
ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে।
শীকের, সনে। সেজেছে, রণে॥
লাহোরা, ধিপ। শিশু দ, লিপ।
তার স, মীপ। সমর, দীপ॥
ধনের, আশ। করি প্র, কাশ।
প্রাণী বি, নাশ। দয়া না, বাস॥
স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে।
শতদ্রু, তটে। পাছে কি, ঘটে॥
তোমার, কার্য্য। নহে নি, বার্য্য।
পাইবে, ধার্য্য। শীকের, রাজ্য॥
না হয়, ভঙ্গ। রণ ত, রঙ্গ।
শোণিত, রঙ্গ। শোভিত, অঙ্গ॥
দেখিয়া, রীতি। হাসিছে, ক্ষিতি।
ধনের, প্রতি। এত কি, প্রীতি॥
সমর, স্থলে। কামান, কলে।
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে॥

শীকের, পাপে। তোমার, দাপে।
রণ প্র, তাপে। অবনী, কাঁপে॥
বিকট, বেশে। রুধিরে, ভেসে।
লাহোর, দেশে। কি হবে, শেষে॥
শীক ছু, পাল। ছুধের, বাল।
তারে কি, কাল। যাতনা, জাল॥
হে গুণ, নিধি। বিফল, নিধি।
এ নহে, বিধি। বিদিত, বিধি॥
করুণা, কর। করুণা, কর।
রণ না, কর। সমর, হর॥

কাবুলের যুদ্ধ।

সন ১২৪৮ সাল।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, ভেগেছে কাবেল সুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।

পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা ॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, সয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে ॥
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
পেতেছে কামান কত রণে ॥
ছুড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
রেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে ॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুক্কুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত,
মহানন্দে খায় সব শব ॥

হিংস্র জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শব সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শববৃষ্টি হয়েছে এবার ॥
মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায় ॥
বড় বড় দাড়ি গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধি লোপ হোপ সব হরে।
ছলে ছলে কাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোগল মঙ্গল বাদ্য করে ॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজপুত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম?
দুর্জ্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মানভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট, হত বল রেজিমেণ্ট,
হায় হায় কারে কব সেম ॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়!
চারিদিকে গুলি গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে।
থেঁকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে সুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে॥
পাঁহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ॥
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিধিমতে বিষম বিপদ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিঁপীড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা॥
ছুটিবে যখন গুলি, উটিবে আকাশে ধুলি,
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল।
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল।
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাসুজা ছল করে।
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে॥

এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর ঘার,
জোর তার শোর সার তায়।
জোরবল গোরা দল, চল চল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায়॥
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল॥

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম।

বীররসে বিভাসে, জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ-বহ্নি, বড় বলবান।
না হয় নির্ব্বাণ আর, না হয় নির্ব্বাণ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছা জান
শ্বেত সেনাপতি যত, জলযানে যান॥

কলে চলে জলে তরি, ধূম্রযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান॥
হোয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ॥
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে, শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসুকির, দেহ কম্পবান॥
রেঙ্গুণের গবানর, হবে হতমান।
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান॥
হোরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার, দেহ খান খান॥
কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান॥
ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান॥
ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান॥
শোভা পেতো হোলে পরে, সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা, তৃণের প্রমাণ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান॥

সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে, ধর্ম্মের বিধান ॥
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ ॥

অনল উঠিল জ্বোলে, কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্ব্বাণ ॥
ব্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
হোতে চায় করী সম, স্বরূপ শূকর।
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥
দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী ॥
শূনীসুত মিছে কেন, করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম
ভীরু ফেরু রব করি, জয় করে হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি ॥
ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন, "বগা বাঙ্গালের লগে ॥"

ধোরে থাক্ পাথাভাঙ্গা, মাচরাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অঙ্গা, দোক্কা চূণ রগে॥
রাঙ্গামুথা দল যদি, বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো॥

সন্ধিজলে রণানল, করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান?
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ॥
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে, পিঁপীড়ার পাখা॥
দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া সালীক।
অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক॥
সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার॥
সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায়।
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায়॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, থামিয়া থামিয়া॥
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া॥

কর্ম্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে

—:০:—

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জ্বালাবে ?
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন চলাবে ?
শ্বেতবীর, বাস্থকির, উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর, হয়ে চূর, রসাতলে তলাবে ॥
কোপে কোপে, তোপে তোপে, গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে, শত্রুদলে, কাটচেলা চেলাবে ॥
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাক্‌ছাড়ি, তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে ॥
কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে।
ডুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে ॥
হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে।
মগাই পগাই স্বোণা, কামানেতে গালাবে ॥
সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥
যত গোরা, মেরে হোরা, ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে ॥

—০—

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিষয়ক।

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।

তড়িৎগতি ছন্দ।

হে নটবর, সর হে সর।
ছি ছি কি কর, বসন ধর॥
আমি অবলা, গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা, ছুঁয়োনা কালা॥
করিলে ভারি, বিষম জারি।
নয়ন ঠারি, বধিছ নারী॥
তুমি হে শঠ, দারুণ নট।
কুরব রট, রসিক বট॥
কি হাস হাস, কি ভাষ ভাষ।
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ॥
গোপী-সমাজে, ব্রজের মাজে।
এমন কাযে, মরিহে লাজে॥
আসিয়া জলে, হৃদয় জ্বলে।
কপাল ফলে, কি ফল ফলে॥

চল হে চল, লইব জল।
কি ছল ছল, কি বল বল॥
আমি হে সতী, নব যুবতী।
আয়ান পতি, দুর্জ্জন অতি॥
না জানে প্রেম, মনের ভ্রম।
ননদী মম, সাপিনী সম॥
ননদী-ডরে, শরীর জ্বরে।
থাকিতে ঘরে, পাগল করে॥
সরল নহে, স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে, জীবন দহে॥
আপন বলে, কুপথে চলে।
কথার ছলে, অসতী বলে॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোনা অঙ্গ॥
তব বচনে, প্রেম রচনে।
গোপিনীগণে, হাসিছে মনে॥
বিনতি করি, চরণে ধরি।
কি কর হরি, সরমে মরি॥
পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে।
গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে॥
তুমি গোপাল, পাল গোপাল।
প্রণয় আল, কেন হে জ্বাল॥

গোকুলে থাক, গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক, কেন হে ডাক॥
সুখ আধার, প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার, কি জান তার?
বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি।
আমি রমণী, প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী, হৃদয়-ফাঁসি।
করে উদাসী, ছুটিয়া আসি॥

দীর্ঘ পয়ার।

ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ, ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ।
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ॥
মরি মুরলীর স্বরে, মরি মুরলীর স্বরে।
তোমার অধরে কেন, রাধা নাম ধরে?
থাকি গুরুজন মাঝে, থাকি গুরুজন মাঝে।
নাম ধরে বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজে॥
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে।
কোন্ বংশী এই বংশী, পেলে কার কাছে?
ছি ছি জান কত ছল, ছি ছি জান কত ছল
বাঁশরী কিশোরী বলে, পাসরি সকল॥
বাঁশী কে বলে সরল, বাঁশী কে বলে সরল?

খলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥
শুনে মনোহর বাঁশী, শুনে মনোহর বাঁশী।
ছল কোরে জল নিতে, যমুনাতে আসি ॥
বাঁশী কত গুণ জানে, বাঁশী কত গুণ জানে।
প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥
কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাড়ে তানে।
প্রবেশে অমৃত রস, অবলার কাণে ॥
স্বরে শিহরে সর্ব্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্ব্বাঙ্গ।
উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্গ ॥
ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব।
বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥
মন যুক্ত সুখে দুখে, মন যুক্ত সুখে দুখে।
অমৃত বরিষে বুঝি, ভুজঙ্গের মুখে ॥
শুনি বল বিবরণ, শুনি বল বিবরণ।
বংশীধর বংশী ধর, কিসের কারণ?
তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে।
গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে?
আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃহে যাই চোলে।
আর বাঁশী বাজায়োনা, রাধা রাধা বোলে ॥

—o—

ভাব ও চিন্তা।

ভাব, চিন্তা, এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম।
মনোহর মনোদ্বীপে, উভয়ের ধাম॥
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়।
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়॥
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুবন জুড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে॥
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা।
অথচ উড়িয়া যায়, এ কেমন্ ধারা!
উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই।
বিষয় বিশেষে শুধু, দেখামাত্র পাই॥
দেখা পেলে রাখা ভার, আশা লয় কেড়ে।
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে॥
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্ ধর্ কোরে।
আবার উদয় হয়, অন্যরূপ ধোরে॥
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা।
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা॥

চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ।
অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ॥
এক চিন্তা, চিন্তাযোগে, নানা মূর্ত্তি হয়।
কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয়॥
এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, অনুকূল যারে।
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে॥
থাকেনা দুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে॥
এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত।
বিদ্যা লাভ, বস্তুবোধে, সুখ লাভ কত॥
এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, দুখের আধার।
একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার॥
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা।
আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা॥
মনেরে করিয়া দগ্ধ, তবু নয় স্থির।
ক্রমেতে আহার করে, সকল শরীর॥
অনুকূল হও চিন্তা, আমার এ মনে।
কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে॥
ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার।
চিন্তা সহ সমভাব,সকল প্রকার॥
ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত রয়।
সকল সময়ে কিন্তু, দেখা নাহি হয়॥

নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ।
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস॥
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্ব্বক্ষণ থাকে।
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয়।
পুনর্ব্বার সেই দুখ, ভাবে হয় লয়॥
বুঝিলে নিগূঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে।
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে॥
কর্ম্ম, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাঁই।
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই॥

হাস্য।

রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ" রূপ, ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি, মানস আভাস।
হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গিভরে, ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ, কোথা উঠে শোক॥
আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর, কভু মনোলোভা॥

বিষাদ বিষম বায়ু, বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব শোভা, লুপ্ত হোয়ে যায়॥
তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত, লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর, দিনকর-করে।
বদন বিপিন-শোভা, একেবারে হরে॥
নয়ন নিকুঞ্জপুরে, জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক, হইয়া প্রবল॥
এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব যোগে।
আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে।
ফলে যবে সুখ সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র, শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে, পলক পল্লব।
চঞ্চল পুতলি যেন, কুসুমবল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত, হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে, সুরূপ সম্পদ॥
হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুষ্করে।
দশন হংসের শ্রেণী, সুখেতে বিহরে॥
হায়রে বিচিত্র ভাব, বলিহারি যাই!
এমন মধুর বুঝি, আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হাসির মাধুর্য্য কত, প্রণয় মিলনে॥

বলিতে বচন নাই, সে রস সুরস।
প্রমোদ- পয়োধি-জলে, নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী, বিনোদ বিম্বাধরে।
হাস্য যোগে কত রস, রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে, মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ে, সুখোদয় কিবা॥
অথবা শিশিরকালে, ফুল্লশতদল।
মধুপানে মহাসুখী, মধুকরদল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপদ্ম বিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে, অমৃত বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে॥
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি।
সরলতা তোর গুণে, হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য শোভা, ভাবুক-বদনে।
চঞ্চলা চপলা দিশি, শোভিত সঘনে॥
অথবা গগনে যেন, নক্ষত্র সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি. করে অকস্মাত॥
এই আছে এই নাই, এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি, সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম, স্নিগ্ধ আভা ধরে॥

স্মেরমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন, হয় হরষিত ॥
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥
কেবল ঘৃণার হাস্যে, ঘৃণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥

—:০:—

কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ।

কাল-সুতা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখভোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম. গণ্ডগোলযোগে ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত হইবে কোন জন।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল।
তাহাতে চড়িল বর, বারো চক্রপাল ॥

প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর।
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর॥
অধ ঊর্দ্ধ ঝাঁতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক।
সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক॥
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ।
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়।
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময়॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে।
ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে॥
কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সুখে॥
সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া॥
রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া।
ঘূরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া॥
তারা, তিথি আদি করি, শালা শালী যারা।
কাণ্ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা॥
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি।
শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি॥
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার॥

বসন্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার।
ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥
কুটুম্ব অয়ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে।
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হোয়ে ॥
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত ॥
আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥
ওলাউঠা, বিকার, বসন্ত আর জ্বর।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥
এরা সব রবাহুত, কত পালে পালে।
হোয়েছিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে ॥
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া।
আশীর্ব্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়া ॥
বিবাহ হইল শেষ, ওহেঁ বর্ষবর।
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর ॥
একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা।
দেখো যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥

গিরিরাজের প্রতি মেনকা।

—০—

স্বপনে হেরিয়া তারা, তারাকারা ঝুরে ধারা,
ধরণীধরেন্দ্রদারা,
শোকে স্বরা শয্যা হতে উঠিল।
কান্দিয়া ব্যাকুলা রাণী, মুখে নাহি স্বরে বাণী,
শিরে হানি পদ্মপাণি,
গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল॥
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাঁপে দ্বারবাসী,
স্বামির সমীপে আসি,
রোদনবদনে রাণী কহিছে।
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক,
সদা দুখ ফাটে বুক,
দিবানিশি খেদে তনু দহিছে॥
দুখে দগ্ধ হয় দেহ, দুহিতারে আনি দেহ,
উমা বিনা নাহি কেহ,
ভবে মন স্থির নাহি রহিছে।

তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,
বিদীর্ণ হইত প্রাণ,
পাষাণ বলিয়া সুধু সহিছে॥
কেমন কর্ম্মের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
আমার সমান কুত্র,
অভাগিনী বুঝি আর নাই হে।
সবে মাত্র এক কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
এক দিবসের জন্যে,
সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে॥
সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত্ব,
বুঝেছ কি গূঢ়তত্ত্ব,
কি কহিব তুমি হও স্বামী হে।
অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি,
জেতে নারী যেতে নারি আমি হে॥
দুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
রাজ্য হউক ছার খার,
কিছুতে না সাধ আছে আর হে।
শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্নজল,
আহার ধুতূরা ফল,
বিল্বতল বাসস্থল সার হে॥
অগ্নিলাগা ভাল ভাল, নাম কাল কাল-কাল,

নাহি মানে কালাকাল,
চিরকাল সুখে কাল কাটে হে।
একভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে,
তাল দেয় কাছে কাছে,
তালে তালে নাচে নানা ঠাটে হে॥
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ,
ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে।
গৃহযোত্র গোত্র গাঁই, কিছুর ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই,
একেবারে তাই সার কোরেছে।
পরিধান ব্যাঘ্রছাল, শিরে কটা জটাজাল,
চক্ষু লাল মহাকাল,
আপনি বাজায় গাল সুখে হে।
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,
দুহাতে মড়ার খুলি,
আগম নিগম পড়ে মুখে হে॥
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জামাতায়,
ভাসাইল দুহিতায়,
দারুণ দুঃখের সিন্ধুজলে হে।
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ দেবতারে,

কি বলিয়া দেব-দেব বলে হে ?

তুল্যবোধ রাগারাগ, তবে নাহি অনুরাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ,
ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে।

শ্মশানে মশানে যায়, ভূত-প্রেত সঙ্গে ধায়,
ছাইভস্ম মাখে গায়,
কাঁদে হাসে হরিগুণ গানে হে॥

রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে,
অদ্রিনাথ শুনে হাসে,
অবিদ্যার অবজ্ঞা ঈশানে হে।

প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্মা শিবশিবা,
রাণী তা বুঝিবে কিবা,
সারমর্ম্ম বেদে নাহি জানে হে।

সমবোধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব,
জামাতা সে সদাশিব,
মহামান্য দেব অগ্রভাগে হে।

হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর
শিবনিন্দা তবে কর,
দক্ষযজ্ঞ মনে কর আগে হে।

—:০—

বর্ষার নদী।

গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূষর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায়॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার॥

বাবু দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু।

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য,
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই?
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।

মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মুরহর ধাতা স্মরহর॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়;
সমুদয় করিতেছে গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক,
ধর্ম্ম হয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ!
খরতর বেগধর, লম্বোদর রত্নাকর,
নিরন্তর তরঙ্গ গভীর।
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুষ্ক কর সমুদয় নীর॥
দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু সুখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা॥
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে।
নাহি রাখ অবয়ব, উদরায় স্বাহ সব,
ব্যাঘ্র-আদি জন্তু খাও ধোরে॥
যত সব পক্ষীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত,
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।
তঞ্চ করি পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ॥

অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট বদন ছাড়া নয়।
গয়ায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয়।
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,
থর থর কাঁপে নরগণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণুতুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ॥
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার॥
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মূষলের বেশ ধরি,
যদুকুল করিয়াছ হত॥
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে।

ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন,
মাটী শুদ্ধ পূরিয়াছ পেটে।
লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালো দুই দলে,
সে দিনেতে করিয়া নিধন।
টুপি কুর্ত্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,
সমুদয় করেছ ভক্ষণ॥
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্তু নানা,
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার।
কেবল খাবার ধুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড়ঋতু পরিবার,
সমুচয় পেটে দেয় পূরে॥
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে।
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয়া খাও,
দেখে শুনে হারা হই দিশে।
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,
এত খেয়ে পাক পায় কিসে?
কন্যাপুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা,
শোকাকুল প্রতি জনে জনে।
ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার,
বিধবার নীরদ নয়নে॥

কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট,
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল।
নদ নদী খাও তবু, নির্ব্বাণ না হয় কভু,
প্রজ্জ্বলিত জঠর অনল ॥
পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য,
মত্ত সদা খাদ্য গুণ গেয়ে।
বার বার বারযোগে, পুষ্ট তনু দুষ্টভোগে,
মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
অধম না দেখি আর হেন।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তাঁয়,
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপী দুরাচার।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
তবু তুই করিলি আহার ॥
গুণে বশ দিগ্‌দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তার।
এই দেখ সবে ক্ষুণ্ণ, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,
জগৎ করিছে হাহাকার ॥

———o———

প্রেম-নৈরাশ্য।

যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেঁট করে বিনোদ বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে॥
হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে॥

প্রেম।

যথার্থ প্রেমের পথে, পেথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায়, স্নিগ্ধ তার মন ॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ॥
সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥
ভাব তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে ॥
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা।
মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা ॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, অনুরাগ ফলে।
পড়া পাখী না পড়াতে, কত বুলি বলে ॥
আঁখির উপরে পাখী, পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায় ॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে ॥

পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন ॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে ॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয় সুখের সার, প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন ॥
আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে।
প্রেমোদিত করে যাহে, যত সব সুরে ॥
উথলয় সুখসিন্ধু, পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দু ॥
সে ক্ষুধার সুধা মাত্র, নাহি এককণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

অসুরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র।
রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥
যার লাগি হলো ধ্বংস, যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা, রেবতীরমণ ॥

অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান।
বিদ্যজন খাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

অমল কমল সম, কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা॥
দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা, ভাবকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্ব্বজন॥
যাহার প্রসাদে পরিহত, পুত্রশোক।
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আকর।
রজত কাঞ্চনময়, সুমেরু শেখর॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ, রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মুল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে॥
কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয়॥
ক্ষেপণ করিব দূরে, প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি, সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুন পুন এই বাক্য, কহে যত মুনি॥
ইহধরা দুখভরা, অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে॥
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে॥
দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ॥
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন॥
রসনায় রসবারি, খর স্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লজ্জাভয়॥
এইরূপ স্বর্গভোগ, লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥

প্রণয়।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা॥
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জর জর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে॥
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।

প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুলনা তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃত বাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
ত্রিয় হেরে ত্রিয়মান রয়॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দূষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষেরে সুখে॥

আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া॥
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে॥
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চোলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে॥
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁখিজলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি॥
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে॥
সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।

উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এবার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
রেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা।

কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে?
দিন দিন তনু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥
সদা যার স্নেহভার, শিরে মরি বোয়ে।
আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে?
একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে।
বিরহ যাতনা আর, কত রব সোয়ে?
বুঝি তার আশাপথে, পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে, নিরাশার দুখ ॥

এমন না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে?
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেঁদে॥
বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে॥
সবে তার এক মন, এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাঁধা॥
হোক্ হোক্ তার হোক্, সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে?
যদি না আসিবে সেই, বাঁধাপ্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে?
যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা।
এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা॥
বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয়॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলে বাঁচি॥
বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে॥

বিলাতের টোরি ও হুইগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি॥
হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে॥
টোরি আর হুইগের, যে হন্ প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশল॥

চাতকের ভাব যথা, জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি॥
যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই॥
শুধু সুবিচার চাই॥

চারিদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু, সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস।
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই॥
শুধু সুবিচার চাই॥

পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ।
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ॥
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি, জাতি আর দেশ।
কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দ্বেষ॥

নির্ম্মল নয়নে কর, কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে, সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে, স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

দুর্জ্জন তস্কর ভয়ে, ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব॥
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন, জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর, নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের, দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

প্রভাতের পদ্ম।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ কোরেছে নিজ রূপ।
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কি বা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে. হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ॥
কমল দলের তলে, রবি-ছবি জলে জ্বলে,
বিদূরিত হোতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।

মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,

* * *

মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥

কবি।

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি।
কবিসহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট॥

ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কি বা চিত্র, বিনাশের নয়॥
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ।
কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ॥
পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় দুখ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা॥
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি॥

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সাহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নহি কটূভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল॥
ভাল মন্দ জানিতেনা, মলমূত্র মানিতেনা,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত।

পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥
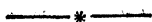
স্বদেশ।

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥

যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তি ভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রস্থতী তোমারে যেই, তাহার প্রস্থতী এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাণী-করে ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।

বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ ॥

দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান।
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হোলনা ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা ?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে ?
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা।

সমাপ্ত।